ইস্কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
অমৃতের সন্ধানে

শ্রীল প্রভুপাদ নিভৃতে তাঁর ঘরে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে একদিন আলোচনা করার সময় বলেছিলেন যে, একদিন কীর্তনের সময় জগন্নাথদেবের বিগ্রহের সম্মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্যের কথা তাঁর মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন - পুরীতে জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এত ভাববিহ্বল হয়ে নৃত্য করতেন যে, ভাববিহ্বল কণ্ঠে 'জগ-, জগ' ছাড়া আর কিছু বলতে পারতেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাবতেন, "কৃষ্ণ, কতদিন ধরে আমি তোমায় দেখতে চেয়েছি। আর এখন আমি তোমাকে দর্শন করছি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পুরীতে অবস্থান করছিলেন, তখন প্রতিদিন প্রায় পাঁচশ লোক একসঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে যেতেন, এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে বিরাট কীর্তন হত, প্রতিটি দলে চারজন মৃদঙ্গবাদক থাকত এবং আটজন করতাল বাজাত। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "বাঁ পাশে একদল, ডান পাশে একদল, সামনে একদল এবং পিছনের দিকে একদল, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাঝখানে থাকতেন। তাঁরা সকলে নাচতেন, এবং চারটি দল কীর্তন করতেন–

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

তিনি যতদিন জগন্নাথপুরীতে ছিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা এইভাবে কীর্তন-নর্তন হত।"

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমৃতের সন্ধানে

ইস্কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

চতুর্দশ বর্ষ ◗ তৃতীয় সংখ্যা ◗ জুলাই ◗ আগস্ট ◗ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক ঃ শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী সুধী সুশীল দাস ব্রহ্মচারী
শ্রী দ্বিজেশ্বর গৌর দাস ব্রহ্মচারী

উপদেষ্টা মন্ডলী ঃ শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ দাস
শ্রী সত্যরঞ্জন বড়ৈ, [illegible]

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
শ্রী অনিল ঘোষ
শ্রী কাঞ্চন বণিক

আনুকূল্য ঃ প্রতিকপি-২০.০০ টাকা
এবং বাৎসরিক গ্রাহক আনুকূল্য
রেজিঃ ডাকে - ১২০.০০টাকা

কম্পিউটার গ্রাফিক ডিজাইন ঃ প্রসেনজিৎ রাজবংশী ভক্ত

যোগাযোগ করুন

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
স্বামীবাগ আশ্রম:৭৯,৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০
ফোন ঃ ০৪৪৭৭২৫৬৭২০, ০১৯১৪৫৭৩২৯৪, ০১৭৩০০৫৯২০৯

(বিঃদ্রঃ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট

পরমার্চনীয়, পরব্রহ্ম, যাঁর নেত্রযুগল নীল-কমলদলের ন্যায় উৎফুল্ল সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব নিত্যকাল পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পুরীধামে অবস্থান করেন।

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

গৌরাব্দ- ৫২৩, বঙ্গাব্দ- ১৪১৪-১৫১৫, খ্রিষ্টাব্দ- ২০০৯

তারিখ		বিবরণ
৮ শ্রীধর, ১৬ জুলাই ২০০৯, বৃহস্পতিবার	ঃ	নিউইয়র্কে ইসকন প্রতিষ্ঠা দিবস।
১০ শ্রীধর, ১৮ জুলাই ২০০৯, শনিবার	ঃ	**কামিকা একাদশীর উপবাস।**
১১ শ্রীধর, ১৯ জুলাই ২০০৯, রবিবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.২২ মিঃ থেকে ৯.৫০ মিঃ মধ্যে।**
২৪ শ্রীধর, ১ আগষ্ট ২০০৯, শনিবার	ঃ	**শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দের ঝুলন যাত্রা আরম্ভ।**
২৫ শ্রীধর, ২ আগষ্ট ২০০৯, রবিবার	ঃ	**পবিত্রারোপিনী একাদশীর উপবাস। পক্ষবর্ধিনী মহাদ্বাদশী। শ্রীল রূপ গোস্বামীর তিরোভাব।**
২৫ শ্রীধর, ২ আগষ্ট ২০০৯, সোমবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.২৯ মিঃ থেকে ৯.৫৩ মিঃ মধ্যে।**
২৮ শ্রীধর, ৫ আগষ্ট ২০০৯, বুধবার	ঃ	ঝুলন যাত্রা সমাপ্ত, ভগবান শ্রী বলরামের আবির্ভাব (দুপুর পর্যন্ত উপবাস), চাতুর্মাসের দ্বিতীয় মাস আরম্ভ (এক মাস দধি বর্জন)
১ হৃষিকেশ, ৭ আগষ্ট ২০০৯, শুক্রবার	ঃ	শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকা যাত্রা।
৮ হৃষিকেশ, ১৪ আগষ্ট ২০০৯, শুক্রবার	ঃ	পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী (আবির্ভাব) (মধ্য রাত্রি পর্যন্ত নির্জলা উপবাস) পরে অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করা যেতে পারে।
৯ হৃষিকেশ, ১৫ আগষ্ট ২০০৯, শনিবার	ঃ	শ্রী নন্দোৎসব শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)।
১১ হৃষিকেশ, ১৭ আগষ্ট ২০০৯, সোমবার	ঃ	**অন্নদা একাদশীর উপবাস (সিংহ সংক্রান্তি)।**
১২ হৃষিকেশ, ১৮ আগষ্ট ২০০৯, মঙ্গলবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৩৫ মিঃ থেকে ৯.৫৩ মিঃ মধ্যে।**
১৮ হৃষিকেশ, ২৪ আগষ্ট ২০০৯, সোমবার	ঃ	শ্রীঅদ্বৈত পত্নী শ্রীমতি সীতা ঠাকুরানীর আবির্ভাব।
২১ হৃষিকেশ, ২৭ আগষ্ট ২০০৯, বৃহস্পতিবার	ঃ	শ্রীমতি রাধারানীর আবির্ভাব (রাধাষ্টমী) দুপুর পর্যন্ত উপবাস।
২৫ হৃষিকেশ, ৩১ আগষ্ট ২০০৯, সোমবার	ঃ	**পার্শ্বৈ একাদশীর উপবাস।**
২৬ হৃষিকেশ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯, মঙ্গলবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৪০ মিঃ থেকে ৯.৫২ মিঃ মধ্যে।** ভগবান শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব (একাদশীর দিনেই উপবাস হয়েছে)। শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব।
২৭ হৃষিকেশ, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৯, বুধবার	ঃ	শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)।
২৮ হৃষিকেশ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯, বৃহস্পতিবার	ঃ	অনন্ত চতুর্দশী ব্রত, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব
২৯ হৃষিকেশ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯, শুক্রবার	ঃ	শ্রী বিশ্বরূপ মহোৎসব শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস গ্রহণ চাতুর্মাসের তৃতীয় মাস আরম্ভ (এক মাস দুধ বর্জন)
৭ পদ্মনাভ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৯, শুক্রবার	ঃ	শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকা পদার্পণ
৮ পদ্মনাভ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯, শনিবার	ঃ	শ্রীল প্রভাবিষ্ণু স্বামী মহারাজের আবির্ভাব (ব্যাস পূজা)
১১ পদ্মনাভ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯, মঙ্গলবার	ঃ	**ইন্দিরা একাদশীর উপবাস**
১২ পদ্মনাভ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯, বুধবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৪৫ মিঃ থেকে ৯.২১ মিঃ মধ্যে।**
১৩ পদ্মনাভ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, বৃহস্পতিবার	ঃ	**শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি (ব্যাস পূজা) ও** বিশ্ব হরিনাম দিবস
২১ পদ্মনাভ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯, শুক্রবার	ঃ	শ্রীশ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা, সপ্তমী পূজা।
২৪ পদ্মনাভ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯, সোমবার	ঃ	শ্রীশ্রী রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব, শ্রীপাদ মাধ্বচার্যের আবির্ভাব
২৬ পদ্মনাভ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯, বুধবার	ঃ	**পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস**
২৭ পদ্মনাভ, ১ অক্টোবর ২০০৯, বৃহস্পতিবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৫০ মিঃ থেকে ৯.৩৬ মিঃ মধ্যে।**

ভগবানকে সন্তুষ্ট করার সহজ পদ্ধতি

– শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

২৩মার্চ ১৯৬৭ আমেরিকার স্যান ফ্রানসিসকো শহরের ইসকন মন্দিরে
শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত শ্রীমদ্ভাগবত প্রবচন থেকে সংকলিত

ভক্তিভাব ছাড়া কেবলমাত্র যদি আমরা লক্ষ লক্ষ বছর ধরেও শ্রবণ করতে থাকি, তাতে কোনও লাভ হবে না। 'ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া'। এই হল পরমতত্ত্ব উপলব্ধির পন্থা। প্রথম জিনিসটি হল মানুষকে বিশ্বস্ত হতে হবে। দ্বিতীয় জিনিস হল তাকে চিন্তাশীল হতে হবে। তৃতীয় জিনিস হল যে, তাকে অবশ্যই জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

কি সেই জ্ঞান? "আমি এই দেহটি নই।" আর তারপর চাই অনাসক্তি। যখনি আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে যে, আমি এই দেহটি নই, তখন কেন আমার এই দেহটাকে নিয়ে অত যত্ন-আত্তি করতে যাব? আমার আত্মার যত্ন নেওয়াই ভাল। আর যখনি এই যোগ্যতা অর্জিত হবে, তখনই নিজের মধ্যে দেখা যাবে আমি কে। পশ্যন্তি আত্মনং চাত্মনি।

আর এই সমগ্র পদ্ধতিটাই ভগবদ্ভক্তির প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং প্রামাণ্য সূত্র থেকে ভক্তিকথা শ্রবণের মাধ্যমেই সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। পরমতত্ত্ব উপলব্ধির এইগুলিই হল যোগ্যতা।

ভাগবতের ১/২/১৩-১৪ শ্লোক দুটিতে তাই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, কিভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনের মাধ্যমে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। পরমতত্ত্ব উপলব্ধি হলে একটা কর্মকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া শুরু হবেই। যেমন, আমরা কখনও ব্যবসা-বাণিজ্য করি। প্রথমে পরস্পরকে জানি এবং চুক্তির মাধ্যমে বোঝাপড়া হয়। তারপরে ব্যবসায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তার পরের ধাপে আসে লাভের কথা।

তেমনি, হয়ত একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে পরস্পরকে বিবাহ করতে রাজী হল। তা হলে তখন একটা বোঝাপড়া তো হল– "হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিবাহ করব। তুমি আমার স্বামী হবে।" "তুমি আমার স্ত্রী হবে।" এটা হল বোঝাপড়া, চুক্তি। তারপরে তারা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী মতো বসবাস করতে থাকবে। আর তার ফলে তারা সুন্দর সন্তান লাভ করবে। সব কিছু হবে, তবে প্রথমে একটা সুসম্পর্ক তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। তারপরে সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে শুরু হবে। আর তার পরিণামে তৃপ্তি লাভ।

ঠিক তেমনি, যদি আমরা পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারি– ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান– এই তিন পর্যায়ে, যদি বুঝতে পারি পরমেশ্বর ভগবানই সর্ব কারণের পরম কারণ আর আমি সেই কারণেই পরিনাম, তখন আমার কর্তব্য কি হবে?
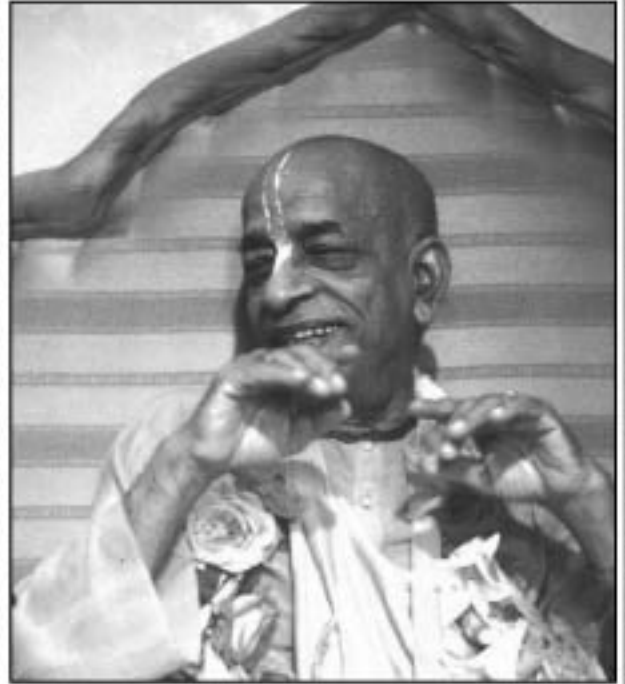
সেই কর্তব্যের কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৩) বলা হয়েছে– অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা শ্রীল সূত গোস্বামীকে যে ছ'টি প্রশ্ন করেছিলেন, একে একে সেইগুলির উত্তর দিতে শুরু করে তিনি এইভাবে বলতে থাকেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, হে ব্রাহ্মণগণ!" সেখানে সমবেত সমস্ত ঋষিরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে তিনি সসম্ভ্রমে বলতে শুরু করেছিলেন, "স্বীয় প্রবণতা অনুসারে সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করা হয়ে থাকে।

বর্ণাশ্রম বিভাগটা কি রকম? প্রথম শ্রেণীর মানুষ হলেন ব্রাহ্মণ, পারমার্থিক জ্ঞানী; দ্বিতীয় মানুষ হলেন ক্ষত্রিয়, প্রশাসক, রাজ্য শাসন করেন; আর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষদের কাজ অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে দক্ষতা অর্জন, তারা বৈশ্য; এবং চতুর্থ স্তরের মানুষেরা শ্রমজীবী, শ্রমিক শ্রেণী, তারা শূদ্র।

সমাজের এই স্বাভাবিক বর্ণবিভাগ। আর পারমার্থিক প্রগতিক জন্যও আশ্রম বিভাগ করা আছে। সেটা কি রকম? ব্রহ্মচারী– পারমার্থিক জীবনে প্রথম পর্যায়; তারপরে গৃহস্থ– পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দায়িত্ব সহকারে ভদ্র সংযতভাবে জীবন যাপন; তারপরে বানপ্রস্থ– অবসর প্রাপ্ত জীবন; তারপরে সন্ন্যাস– সর্বত্যাগী জীবনযাপন। এই হল বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ। বর্ণ মানে সমাজ-ব্যবস্থায় চারটি শ্রেণীবিভাগ, আর আশ্রম মানে পারমার্থিক বিকাশের চারটি শ্রেণীবিভাগ।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে–" ব্রাহ্মণগণ, বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুসারে প্রত্যেকেরই কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে।" কি সেই কর্তব্য? 'স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য'। স্বধর্ম অনুসারে প্রত্যেকেরই বিশেষ ধরনের কর্মপ্রবৃত্তি থাকে। ব্রাহ্মণের স্বধর্ম অনুসারে কর্মপ্রবৃত্তি রয়েছে। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম প্রবৃত্তি রয়েছে। তেমনি, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ– প্রত্যেকেরই বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। সকল শাস্ত্রেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও তার উল্লেখ আছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লেখ রয়েছে।

মানুষকে চিনতে হবে তার কর্মের পরিচয়ে,– জন্ম অনুসারে নয়।

বাস্তবিকই, শাস্ত্রাদিতে জন্মের কোন প্রশ্নই তোলা হয় না। যে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারেন, যে কেউ ক্ষত্রিয় হতে পারেন, যে কেউ সন্ন্যাসী হতে পারেন, যে কেউ ব্রহ্মচারী হতে পারেন– তবে তাঁকে সেই বর্ণাশ্রমের গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

ভাগবতে তাই বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবানকে যদি সন্তুষ্ট করতে হয়, তা হলে স্বধর্ম যথাযথভাবে পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে– সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্। নিজের কর্তব্যকর্মে সিদ্ধি লাভ করতে অভিলাষী হলে, পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা চাই।

আপনি কি কাজে নিযুক্ত, তার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। ব্রহ্মচারী হতে পারেন, গৃহস্থ হতে পারেন, সন্ন্যাসী হতে পারেন এবং আপনি শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত হতেও পারেন, ব্রাহ্মণ হতে পারেন, কিংবা প্রশাসন দক্ষ হতেও পারেন। যা-ই হোক, সেটা কোন প্রশ্ন নয়। কিন্তু আপনার কর্তব্য, আপনার স্বধর্মোচিত সেবা যদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সৎভাবে নিবেদিত হতে থাকে, তবে সুনিশ্চিতভাবে আপনার স্বধর্মানুসারে কৃতকর্ম সার্থক সিদ্ধি লাভ করবেই। একেই বলে কৃষ্ণভাবনামৃত।

কোনও ক্ষতি নেই যদি কেউ শ্রমিক শ্রেণীর ঘরে জন্ম নিয়ে থাকে কিংবা অশিক্ষিত, অথবা কেউ হয়ত উচ্চশিক্ষিত বা বনেদী পরিবারে জন্মেছে। এই সমস্ত জড়জাগতিক যোগ্যতার মাপকাঠি দিয়ে পারমার্থিক বিবর্তন যাচাই করা হয় না। পারমার্থিক বিবর্তনের ধারায় আপনার গুণবৈশিষ্ট্য, আপনার সামর্থ্য, আপনার কর্মোদ্যোগ, আপনার বুদ্ধিবৃত্তি–সব কিছু দিয়ে পরম ভক্তিভরে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে। তাতেই আপনার সার্থক সিদ্ধি।

ধরা যাক, আপনি ব্যবসায়ী এবং একটা কিছু ব্যবসা করছেন। এখন, তার মানে এই নয় যে, আপনি যখন মস্ত ধনী হয়ে উঠবেন, তখন আপনার সার্থক সিদ্ধি লাভ হল। সেটা সার্থকতা বা সিদ্ধিলাভ নয়। সার্থক সিদ্ধি তাকে বলে, যার দ্বারা আপনি আপনার স্বধর্ম প্রবৃত্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন। আপনি কত বড় কাজ করছেন বা কত আয় করতে পেরেছেন। আপনি কত বড় কাজ করছেন বা কত আয় করছেন, তাতে কিছু যায় আসে না।

জানলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ছেলেবেলায় এক গরিব বন্ধু ছিল। নাম তার শ্রীধর। তখনকার দিনে পাঁচশ বছর আগে তার দৈনিক রোজগার ছিল বড় জোর পাঁচটি পয়সা মাত্র। তাও হত না। তার মধ্যে সে আড়াই পয়সা দিয়ে গঙ্গা পূজা করত আর বাকি আড়াই পয়সার সংসার চালাত।

এমনি অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আপনার কত আয় সেটা বড় কথা নয়– পাঁচ পয়সা কি পাঁচ হাজার টাকা। আপনার করা চাই-ই। অবশ্যই।

কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারেন? তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ/ শ্রোতব্যঃ

(বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠায়)

প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে

– শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীগৌর-ভগবানের বৈকুণ্ঠ ও জড় জগতের পার্থক্য

শ্রীগৌর-ভগবানের দুই প্রকার রাজ্য। প্রথম প্রকার–তদ্রূপ-বৈভব গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধাম সমূহ এবং দ্বিতীয় প্রকার সৃষ্টি–দেবীধাম, ব্রহ্মাণ্ডাদি। বৈকুণ্ঠাদির স্থিতি প্রকৃতির অতীত ভূমিতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত রাজ্যে। তথায় খণ্ড কাল প্রবেশ করিতে পারে না, প্রাকৃত গুণ অধিকার লাভ করে না, জড়বদ্ধ-জীবের নিন্দিত কামের গতি তথায় নাই। জড়জগতে স্বর্গাদি লোক-সমূহে গুণের ক্রিয়া, জীবের ফল–ভোগ ও কৃষ্ণ-প্রেমের অভাব লক্ষিত হয়। শ্রীগৌর-ভগবান্ স্বীয় প্রকাশ নিত্যানন্দ-প্রভুর রূপ মহাবৈকুণ্ঠ-স্থিত সঙ্কর্ষণের অংশ কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণুদ্বারা নিত্যপ্রকাশ বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুও নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন বলিয়া কাহারও বৈকুণ্ঠকে দেবীধামের মত স্থান মাত্র মনে করা উচিত নহে। ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত ও কালান্তর্গত। কিন্তু বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত ও কালাতীত।

অপ্রাকৃত জগতে শূদ্রত্ব নাই

অপ্রাকৃত রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের বস্তুগত নিত্য অস্তিত্ব নাই, পরন্তু তত্তদ্ভাব আছে মাত্র। প্রাকৃত জড় ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির বস্তুগত নশ্বর অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই যে, অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্য শূদ্রত্বের বস্তুগত অধিষ্ঠান আছে–এরূপ নহে। জড়জগতের নশ্বর শূদ্রাভিমানের বস্তুগত সত্তা অপ্রাকৃত রাজ্যেপ্রবেশে সহায়তা করে–মনে করিয়া, অবৈষ্ণব প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় প্রাকৃত-রাজ্যে ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করেন।

সহজিয়ারা নিন্দুক, শূদ্র ও পাপচারী সুতরাং অবৈষ্ণব

ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা করেন না বলিয়া প্রাকৃত সহজিয়াকে লোকে নিন্দা করে। যোগ্যতার অনাদরে তাঁহাকে অব্রাহ্মণ বা সদগুণের বিরোধী মনে করে। বদ্ধজীব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে অসৎ বা অশুভ কর্ম্ম– যাহাকে পাপ বলে, সেই পাপ অনুষ্ঠান করিয়া লৌকিক মর্য্যাদাহীন হয়। পাপিষ্ঠগণ প্রাক্তন কর্ম্মফলে শূদ্রাভিমানে প্রমত্ত হয়। পুণ্যকর্ম্ম-প্রভাবে প্রাক্তন কর্ম্মফলে জড়বদ্ধজীব সগুণ ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া মর্য্যাদাবান্ হন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ পাপচিত্ত বলিয়া বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিতে ভালবাসেন, শূদ্রজ্ঞানে ঘৃণা করেন, এবং প্রকারান্তরে পাপিষ্ঠ বলেন, সুতরাং শূদ্রের বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব -শরীরে–এই কথা বিশ্বাস না করিয়া, পাপকর্ম্মে আসক্তি প্রভাবেই তাঁহার মঙ্গল হইবে, মনে করেন।
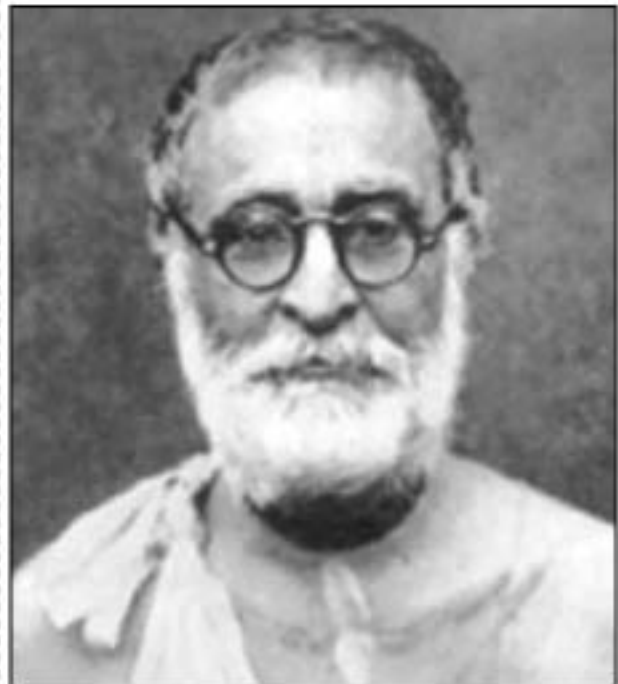
ব্রাহ্মণগণই বৈষ্ণব হইবার যোগ্য– অন্যে নহে

ব্রাহ্মণগণ প্রাকৃত রাজ্যে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া মিশ্রগুণ সমূহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেই নির্গুণতা লাভ করেন। তখনই তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ষড়বিংশগুণ-সম্পন্ন বৈষ্ণব হন। ব্রাহ্মণের কর্ম্মাধিকার ও দক্ষিণা-গ্রহণাদি ফলকামনা নিরস্ত হইলে বিষ্ণু কৈঙ্কর্য্যের বৃত্তিসমূহ উদয় হয়। বিষ্ণুর যথায় অবস্থান নাই, সেই মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত জড় ভোগাতীত রাজ্যে বিষ্ণুকে লাভ করিয়া তাঁহার অনুশীলন করেন।

ব্রাহ্মণগণ সাত্ত্বিক এবং শূদ্র তমোগুণাচ্ছন্ন ও পাপ পরায়ণ-

যে-কাল পর্য্যন্ত শূদ্রতাই বিষ্ণু-সেবার আধার-জ্ঞান হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত জীব পাপিষ্ঠ বলিয়া আপনাকে হীন জ্ঞান করেন এবং বিষয়-সেবা করিয়া হরি-সেবাহীন অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণবাভিমান জানেন। তমোগুণাচ্ছন্ন জীবই শূদ্র। সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট জীবই ব্রাহ্মণ। পাপবুদ্ধি-বিশিষ্ট শূদ্র, স্বীয় পাপ-রূপ উপচারে কখনই বিষ্ণুসেবা করিতে পারে না। অবশ্য মিশ্র-সত্ত্বাভিমানে জড়াভিনিবেশ সহ পুণ্যবান্ সকাম বিপ্রত্বেও বিষ্ণুসেবা হয় না। সেজন্যই বর্ণাভিমান-যুক্ত মানব বিষ্ণু-সেবার অধিকারী নহেন।

হরিসেবক বা বৈষ্ণব হইবার উপায়

বর্ণধর্মের সম্যক্ পালন করিতে করিতে তদভিমান নিরস্ত হইলেই অপ্রাকৃত হরিসেবার অধিকারী হন। শূদ্র স্বীয় পাপিষ্ঠতা ত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব হয় না, ব্রাহ্মণ স্বীয় কর্মকাণ্ডীয় পূণ্য কায়-মনোবাকে পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব হইতে পারেন না। ভগবান বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ" (গীতা ৪/১০)– ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণকে গুণ ও কর্ম বিভাগক্রমে ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন। সেকাল পর্যন্ত প্রাকৃত গুণসমূহের গ্রহণ–হরিসেবা প্রবৃত্তির দ্বারা হ্রাস না হয়, সেকাল-পর্যন্ত জীবের কর্মকাণ্ডাধিকার অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগ-রাজ্যে বিচরণ সিদ্ধ হয়। বর্ণাশ্রম-ধর্মোস্থিত ব্রাহ্মণাভিমান লইয়া হরিসেবা করিলে কখনই কেবলা হরিভক্তি সম্ভাবনা নাই। কর্ম-মিশ্রা ভক্তিই তৎকালে জীবকে জড়মিশ্র সেবায় নিযুক্ত করে। তখন কর্মমিশ্র-ভক্তিময় ব্রাহ্মণ ষড়বিংশ গুণের অধিকারী হইয়া জগতে বৈষ্ণব নামে পরিচিত হন, কিন্তু তাঁহার কর্মমিশ্র ভজন ত্যক্ত হইয়া, হরিভজন আরম্ভ হইলেই শুদ্ধ-ভক্তি লাভ হয়।

বৈষ্ণব শূদ্র নহেন, ব্রাহ্মণের গুরু– ইহার উদারহণ

কর্মমিশ্র-ভক্তি আশ্রয় করিয়াও অনেক সকামী বিপ্রকে, শুদ্ধবৈষ্ণব হরিদাস ঠাকুর, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, নরহরি সরকার ঠাকুর, নবনীহোড় ঠাকুর শ্যামানন্দ প্রভৃতির প্রতি বর্ণগত অবরতা আরোপ করিতে দেখা যায়। আবার কর্মত্যক্ত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, হরিদাসগণের মহামহিম চরণকমল আশ্রম করিয়া গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব-মূর্ত্তিকে স্বীয় লোকাতীত বিপ্রত্বের আদর্শ প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণব যদি শূদ্র হইতেন বা পাপিষ্ঠ হইতেন তাহা হইলে কখনই শ্রীল ঠাকুর নরহরি, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামনন্দ, শ্রীল রসিকানন্দ, শ্রীল ঠাকুর কৃষ্ণদাস, শ্রীল গোস্বামী রঘুনাথ দাস, কর্মমিশ্রা ভক্তিযুক্ত বিপ্রের গুরুত্বে বরিত হইতেন না।

শাস্ত্র ও সমাজ-মতে অব্রাহ্মণের হরিসেবায় অনধিকার

আমরা শূদ্রতা বা সকামবিপ্রত্ব ত্যাগ করিলেই হরিভক্তির দাতা-গৃহীতারূপে বৈষ্ণবে পাপ-পূণ্যাধিকার নিদর্শনরূপ বর্ণগত বৈষম্য দেখিতে পাই না। নতুবা অবান্তর উদ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়া কর্মমিশ্রা ভক্তির ব্যাজে বৈষ্ণবে শূদ্রত্বের (সংস্কার-রাহিত্যের) আবশ্যকতা লইয়া এত ব্যস্ততা কেন? শাস্ত্র বলেন, সমাজ বলেন, সদ্ধর্ম বলেন, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অপ্রাকৃত সেবায় অধিকার নাই সেজন্যই অবান্তর লক্ষ্যজীবী সকাম বিপ্রের মধ্যে বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিবার বৃত্তি জাগরূক। বৈষ্ণবগণের পাপোথ শূদ্রতা ব্যতীত অপর গতি নাই। বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু তাদৃশ বিচার হরিভজন-সেবায় বিশিষ্ট অন্তরায়। প্রতিকূল বিচার না ছাড়িলে হরিভজনে উন্নতি হয় না।

("শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার" সৌজন্যে)

৪পৃষ্ঠার পর-ভগবানকে সন্তুষ্টি (শ্রীলপ্রভুপাদ)

কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা (ভাগবত ১/২/১৪)। একাগ্রচিত্তে নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ, স্মরণ এবং তাঁর আরাধনা করা কর্তব্য।

একেন মনসা– একাগ্রচিত্তে, অন্য কোনও বিষয়ে মনকে বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে ভগবানের মহিমা স্মরণ করা চাই। তস্মাদ্ একেন মনসা ভগবান– এখানে ভাগবত বলছে না ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি। মনোযোগ দিতে হবে কেবল ভগবানের দিকেই। তা না হলে মনোযোগ কোথায় দেওয়া সম্ভব? ব্রহ্ম নির্বিশেষ, সেখানে মনোনিবেশ দুঃসাধ্য। পরমাত্মা তো আপনার মধ্যেই রয়েছেন– ধ্যানের মাধ্যমেই তাকে জানা যায়। সুতরাং ভগবানকেই সন্তুষ্ট করাই বাস্তব পন্থা।....

ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকেও বলা হয়েছে, 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ'। পরমেশ্বর ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর উপরে কেউ নেই।".....

সেই ভগবান সাত্বতাং পতিঃ– তার মানে, কত বড় ভক্ত আছেন, আচার্য আছেন, গুরুবর্গ আছেন, তাঁদের সকলেরই প্রভু তিনি।

সুতরাং তাঁর সম্পর্কে আমাদের কি করণীয়? শ্রোতব্যঃ– তাদের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করাই আমাদের সকলের কর্তব্য। কোথায় তাঁদের কথা শোনা যাবে? যখনই তিনি শাস্ত্র মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থিত হবেন, তখনই তাঁর কথা মন দিয়ে শুনে নিতে হবে।

পরমেশ্বর ভগবানকে, সর্ব কারণের পরম কারণ যিনি, তাঁকে চিনবেন কেমন করে? কেউ তা বলতে পারে না। কিন্তু তিনি স্বয়ং যখন বুঝিয়ে দেন, তখন শোনা যায়। সেটি হল ভগবদগীতা। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নিজেকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কেবল তাঁর কাছে শ্রবণ করতে হবে। শ্রোতব্যঃ– কেবল শুনতে হবে। শ্রোতব্যঃ এবং কীর্তিতব্যশ্চ। কেবল শুনলেও হবে না, ভাগবত প্রবচন শুনে বাইরে গিয়ে সব ভুলে গেলে চলবে না। তা হলে কি করতে হবে? কীর্তিতব্যশ্চ–"যা শুনেছি তা অন্যদেরও শোনাতে হবে।" তবেই সিদ্ধি লাভ সম্ভব।

কোটি বছর কেবল শুনলেও সুফল লাভ না হতেও পারে। তাই শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ। ভগবানের মহিমা শুনতে হবে, শোনাতে হবে, তাই নিয়ে চিন্তামগ্ন হতে হবে এবং পূজা করতে হবে। মাঝে মাঝে নাকি? না, নিয়মিত। নিত্যদা– নিয়মিতভাবে। সেটাই সঠিক পদ্ধতি।

অতএব এইভাবে যথার্থ পদ্ধতি প্রক্রিয়া মেনে চলতে যে পারবে, সে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবেই। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে।

এই জন্যই শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং অর্চনের প্রক্রিয়াগুলি আমরা এই মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের অধিষ্ঠানের সময়ে মেনে চলছি। একে বলে আরাত্রিক। সবশেষে কীর্তন এবং আরাত্রিক একসঙ্গে চলতে থাকে। অর্চনের শেষে প্রদীপের তাপ গ্রহণ করতে হয় ভক্তিভরে। প্রসাদ গ্রহণ করতে হয়। এইগুলি সবই খুবই সহজ পদ্ধতি, ব্যয়সাধ্যও নয়, অথচ তা থেকে পারমার্থিক উন্নতি হতে থাকে। জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে– সবাই বলুন।

শ্রীনাম-প্রচার

– সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥১॥

১। 'নদীয়া'– নয়টি দ্বীপস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। 'গোদ্রুমে'– উক্ত নয়টি দ্বীপের মধ্যে গোদ্রুম বা গাদিগাছায়। 'নিত্যানন্দ মহাজন'– শ্রীমহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ঘরে ঘরে নামপ্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; অতএব নিত্যানন্দ-প্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহাটের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক মহাশয়গণই এই কার্য্যে বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নহে।

শ্রদ্ধাবান জন হে!

প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥২॥

২। টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন,–"হে শ্রদ্ধাবান জন! আমি আপনার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এই মাত্র ভিক্ষা যে, আপনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণভজন করুন ও কৃষ্ণশিক্ষা করুন। কৃষ্ণনাম করুন অর্থাৎ নামাভাস ছাড়িয়া চিন্ময় নাম করুন।" নামাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। ছায়া-নামাভাস সহজেই ক্রমশঃ সর্ব্বার্থসাধক 'নাম' হয়। যেহেতু, তাহাতে একটু অজ্ঞানতমঃ থাকিলেও ভক্তি-প্রতিকূল ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-গন্ধ থাকে না। তত্ত্বজ্ঞানভিজ্ঞ লোকেরা প্রথমে ঐ প্রকার নামাভাস করিতে করিতে সাধুসঙ্গ বলে নামরসে অভিজ্ঞ হইয়া শুদ্ধনাম-গানে সক্ষম হন। তাঁহারাও ধন্য। ভুক্তি-মুক্তিফল-কামীদিগের মধ্যেই প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহারা সেই সেই ক্ষুদ্র অভীষ্ট অনায়াসে নামের নিকট লাভ করে বটে, কিন্তু শুদ্ধনাম-চিন্তামণি লাভ করিতে পারে না; কেননা, ভোগ-মোক্ষ-সম্বন্ধীয় ভক্তি-প্রতিকূল বাসনা তাহাদিগকে সহজে ছাড়ে না। বিশেষ ভাগ্যোদয়ে ভক্ত বা ভগবৎকৃপা দ্বারা অকৈতব-হৃদয় হইলে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও শুদ্ধনামের আশ্রয় পান; কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল। হে শ্রদ্ধাবান জন! নামাভাস ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন দ্বারা অধিকার-ভেদে বিধিমার্গে ভজন কর। যদি বিধিমার্গে রুচি থাকে, তবে তদুচিত শ্রীগুরুচরণে ভজন-তত্ত্ব শিক্ষা করত জীবের নিখিল অনর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণালোচনা কর। যদি রাগ-মার্গে লোভ হইয়া থাকে, তবে কোন ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনীর অনুরাগ, চরিত্র অনুকরণপূর্ব্বক যথারুচি ব্রজরস ভজন কর। ব্রজরস-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে তদুচিত গুরুকৃপায় ব্রজে নিত্যস্থিতি ও যোগ্য চিন্ময়-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিবে।

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥৩॥

৩। অপরাধ–দশটি। ১. বৈষ্ণববিদ্বেষ ও বৈষ্ণবনিন্দা। ২. শিবাদি অন্য দেবতাকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক ঈশ্বরজ্ঞান। সেই সেই দেবতাকে কৃষ্ণবিভূতি বা কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিলে আর ভেদজ্ঞান বা অনেক ঈশ্বরজ্ঞান-জনিত দোষ হয় না। (৩) গুরুকে অবজ্ঞা। দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুবাক্যে

(বাকী অংশ ৯ পৃষ্ঠায়)

মায়ামুক্তি

– শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

(শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের প্রবচন থেকে)

এই জড় জগতের সঙ্গে ভগবানের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। স্বাভাবিক কারণেই এই জড় জগতের লোক বা যারা এখানে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তাদের সঙ্গেও ভগবানের প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু যে ভক্ত, এই জড় জগতের প্রতি আসক্ত নয় এবং যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তার উপর তিনি বিশেষ লক্ষ করেন; তার সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ সকলেরই রয়েছে, কিন্তু জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীব তা উপলব্ধি করতে পারে না। তার সেই সম্বন্ধটি অপ্রকট অবস্থায় থাকে কারণ তখনও সে সম্বন্ধ তার হৃদয়ে জাগ্রত হয় নি। কিন্তু কখন তারা জেগে উঠবে? তাদের নিত্য সখা, নিত্য পিতা, নিত্য প্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কখন তারা এই পরম উপলব্ধি স্তরে উন্নীত হবে। কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন, "যিনি চারিবেদের পণ্ডিত, তিনি যদি আমার ভক্ত না হন, তিনি আমার প্রিয় নন। কিন্তু শ্বপচ কুলজাত ব্যক্তি যদি আমার ভক্ত হন, তিনি আমার অতি প্রিয় হন। তিনি আমাকে ভক্তিভরে যা অর্পণ করেন আমি সাগ্রহে তা গ্রহণ করে থাকি এবং তিনি আমার মত পূজনীয়"। এই জগৎ পাপে পূর্ণ। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর চরণে শরণাগত ভক্তের প্রতি সদাই লক্ষ্য রাখেন। আর কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির অর্থই হচ্ছে, তা নিষ্কাম ভক্তি। তার পিছনে কোন কামনা-বাসনা থাকা উচিত নয়, তাহলে সেটিকে ভক্তি বলা যায় না। তা হচ্ছে আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির, ইন্দ্রিয়তোষণের একটা পন্থা মাত্র।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কলকারখানার মালিকের সঙ্গে কর্মচারীর যে সম্পর্ক, তা কি প্রীতির সম্পর্ক? সে কি মালিককে ভক্তি করে? মোটেই না। সে অর্থের লোভে মালিকের আনুগত্য করে। মালিক অর্থ দেওয়া বন্ধ করলে সে আর তার অধীনে কাজ করবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কর্মচারী কখনই মালিকের ভক্ত নয়, সে অর্থের ভক্ত। অতএব আপনি যদি বলেন 'ধনং দেহী' 'রূপং দেহী' 'যশং দেহী',– তাহলে কি সেটা ভক্তি হচ্ছে? তার দ্বারা শুধু ভোগের লিপ্সাটাই প্রকাশ করা হয়। এভাবে ভক্তি অর্জন করা যায় না। এরা কেউই ভগবানের ভক্ত নয়– এরা সকলেই রূপ, ধন, যশ, প্রতিষ্ঠার ভক্ত, এবং কাম ও কামনার দাস। এরা এক রকমের ব্যবসায়ী।

কিন্তু কৃষ্ণভক্ত শুধু বলেন, "হে প্রভু, আমি ধন, জন, প্রতিপত্তি কিছুই চাইনা, আমাকে তোমার চরণে সেবা করার ঐকান্তিক বাসনা দাও।" এই হচ্ছে ভগবানকে সেবা করার বাসনা।

যারা কামনা-বাসনার দ্বারা উৎপীড়িত, তারা জড় ফল লাভের আশায় স্বার্থের বিনিময়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর আশ্রয় নেয়। কিন্তু তারা ভক্ত নয়। তারা কেউই ভগবৎ-সেবা করতে চায় না, তারা চায় ভোগ করতে। যারা কৃষ্ণভক্ত তারাই একমাত্র ভগবানের সেবা করতে চায়।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধাসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

(ভঃ গীঃ ৭/২৩)

অর্থাৎ, যে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে সে সেই বিশেষ দেবলোকে যায়। আর ঐসব দেবলোক সকলই জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে জড়-ব্রহ্মাণ্ড বিনাশের সময় তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। জড় সৃষ্টির ভেতর যেখানেই যাওয়া হোক না কেন তা সকলই দুঃখময়, মৃত্যুর অধীন।

জড় জগতের রূপটা কেমন? তা চরম দুঃখময়। এই প্রসঙ্গে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পূর্বকালে অপরাধীকে নদীতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। অপরাধীকে দীর্ঘক্ষণ জলে ডুবিয়ে রাখার পর যখন জলের ভেতর থেকে বুদ্‌বুদ্ উঠত, তখন আবার তাকে জল থেকে

তুলে কিছুক্ষণ দম নিতে দিয়ে আবার জলে ডুবিয়ে দিত। মানুষের জড় জগতের ভোগটাও এই রকম। তারা সারাদিন গাধার মত পরিশ্রম করে সামান্য একটু সুখ পাওয়ার জন্য। কিন্তু এইভাবে প্রকৃত সুখ বা আনন্দ লাভের পরিবর্তে দুঃখের বোঝাটাই আরো বেড়ে যায়। এটা একটা জিনিষকে বারবার চিবানোর মত অবস্থা। কতবার আমরা এক জিনিষ আস্বাধন করেছি। তবু আমরা ভাবি, "আর একটু দেখা যাক না, যদি আরও কিছু আনন্দ থাকে।" অনেক সময়ে আখ খেয়ে ফেলে দিলে কোন পাগল সেই আখের ছিবড়া থেকে একটু রস পাবার আশায় যেমন সেটা চিবোতে থাকে, আমাদের ভোগ করার বাসনাটাও সেই রকম। আমরা বার বার জড় জগতে দুঃখ পেয়েও বুঝতে চাই না যে, এখানে আনন্দ পাবার কিছু নেই। এ সবই মায়া; আর তা ভগবানের সৃষ্ট। ভগবান বলেছেন-

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া-

অর্থাৎ, 'এটি আমার মায়া এবং তা অতিক্রম করা সুকঠিন।' কিন্তু তারপরই বলছেন,

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।'

অর্থাৎ, 'আমার কাছে যে প্রপত্তি করে সে অনায়াসে এই মায়া অতিক্রম করতে পারে।' সুতরাং এর থেকেই বোঝা যায় তিনি সব সময় তাঁর ভক্তের সম্বন্ধে সচেতন এবং তিনি স্বয়ং তাকে রক্ষা করেন। সুতরাং আপনারাও এই দুর্লভ মানব জীবন সার্থক করে ভগবানের করুণার এই সুযোগ গ্রহণ করুন এবং তাঁর চরণে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় নিয়ে, কামনা-বাসনা রহিত হয়ে, তাঁর সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করুন। এইভাবে ভগবানের কৃপায় মায়ামুক্ত হয়ে, ভগবানের সঙ্গে নিজেদের নিত্য সম্বন্ধের কথা অবগত হয়ে, তাঁর সেবায় যুক্ত হোন এবং চিন্ময় জগতে নিত্যকাল ধরে আনন্দ উপভোগ করুন।

(৭ পৃষ্ঠার পর শ্রীনাম-প্রচার- সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

বিশ্বাস করিবে এবং গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ বা তাঁহার নিত্যপ্রেষ্ঠ শুদ্ধতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা। শ্রুতিশাস্ত্র–বেদ, তদনুগত পূরাণ ও ধর্মশাস্ত্র, তৎসিদ্ধান্তরূপ ভগবদ্‌গীতাশাস্ত্র, তন্মীমাংসাদর্শনরূপ ব্রহ্মসূত্র ও তাহার ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, তদ্বিস্তাররূপ ইতিহাস ও সাত্বত-তন্ত্রসকল এবং তত্তচ্ছাস্ত্রসমূহের বিশদব্যাখ্যাস্বরূপ মহাজনকৃত ভক্তিশাস্ত্রসমূহ। এই সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ শাস্ত্রলিখিত নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা। (৬) নামের বলে পাপাচরণ। শ্রদ্ধায় নাম করিলে পূর্বপাপসমূহ অনায়াসে বিনষ্ট হয়, আর পাপ করিতে রুচি হয় না। যদি নামের ভরসায় পাপ করিতে স্পৃহা হয়, সেটি নামাপরাধ। (৭) ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ প্রভৃতি শুভকর্মের সহিত সমান বলিয়া যিনি নামের নিকট ভোগ-মোক্ষরূপ-ফলের আশা করেন, তিনি– নামাপরাধী। (৮) অশ্রদ্ধাবান, বিমুখ ও শুনিতে ইচ্ছা করেন না এরূপ ব্যক্তিকে হরিনাম দেওয়া অপরাধ। যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে না; কেবল হরিনামে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবার জন্য নাম-মাহাত্ম্য বলিবে। (৯) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি। (১০) অহংতা মমতাপূর্ণ ব্যক্তির হরিনাম-গ্রহণে অপরাধ হয়। জড়শরীরে আত্মবুদ্ধিক্রমে যিনি শরীরগত অভিমান করেন এবং জড়সম্পত্তিতে স্বকীয়বুদ্ধি করিয়া আসক্ত হন, তাঁহার হরিনামাপরাধ স্বভাবতঃ আছে; যেহেতু তিনি সাধ্য-সাধনের চিন্ময়ত্ত্ব-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। হে শ্রদ্ধবান জন! এই দশ অপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব চিৎকণ, কৃষ্ণ চিৎসূর্য্য জড় জগৎ জীবের কারাগার। জড়াতীত কৃষ্ণলীলাই তোমার প্রাপ্যধন।

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার ।৪।

৪। হে শ্রদ্ধাবান জীব! তুমি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। যেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষজনিত কর্ম্মচক্র তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সে পর্য্যন্ত একটি সদুপায় অবলম্বন কর। প্রবৃত্তিক্রমে তুমি গৃহী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ হও বা নিবৃত্তিক্রমে তুমি সন্ন্যাসী হও, সেই সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ-গেহ-স্ত্রী-সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসারে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ও মনকে কৃষ্ণভাব-মিশ্রিত-বিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্ম্মুখতাশূন্য হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। কৃষ্ণসেবানুকূল্যরূপ পরমামৃত ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার স্থূললিঙ্গ-দেহদ্বয় ভঙ্গ করত তোমার নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপকে পুনরুদিত করিবে। চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীবহিংসা, কুটিনাটি প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য সমস্তই অনাচার। সে-সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সার কথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়াপূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। নামকৃপায় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় কৃষ্ণ তোমার সিদ্ধস্বরূপগত নয়নের গোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইলে কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে।

দোষারোপ নয়, চাই আত্ম পরিশুদ্ধি

– শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী

৬ নভেম্বর ১৯৯৫ শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরকক্ষে প্রদত্ত ভাগবত প্রবচন থেকে সংকলিত

আমাদের নিজেদেরই প্রত্যক্ষভাবে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কৃষ্ণভক্ত হয়ে উঠতে হবে। জড়জাগতিক বিষয় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভক্তরূপে বিকাশ লাভ করবার অভিলাষ আমার মধ্যে থাকা চাই। আমার এই জীবদ্দশাতেই ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে চাই। আমি অনেক কিছু চাই। কেন শ্রীকৃষ্ণ সেগুলি আমাকে দিচ্ছেন না? কারণ আমরা যা চাইছি, তা অর্জন করার পন্থা রয়েছে– সেই পন্থার অনুশীলন করতে হবে। এখন আমরা কতটুকু উৎসাহ নিয়ে সাধন-ভক্তির অনুশীলন করব– এটি সম্পূর্ণরূপে আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

পদ্ধতির মূল সূত্রটি আপনারই কাছে রয়েছে। আপনি সাধন ভক্তি অনুশীলনে কতখানি উৎসাহী, নিষ্ঠাবান তা দেখতে হবে। তারপর-অনুশীলনীর মধ্যে যখন আপনি পরমোৎসাহভরে আপনার অভিলাষগুলি নিয়ে আসবেন, তখন উৎসাহ উদ্দীপনা জাগবে, আপনি উন্নতি করতে থাকবেন, ফলাফল আপনি দেখতে পাবেন। ক্রমান্বয়ে দেখবেন, আপনার মন এবং আপনার ইন্দ্রিয়গুলি আত্মনিয়ন্ত্রণে চলে আসছে। জড় বিষয়বস্তু বা বিষয়ের বশীভূত না হয়ে আপনি এক উচ্চতর স্বাদ ('পরং দৃষ্টা') লাভ করবেন এবং তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনি যে কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়ে যে কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায় বা সমাজে অধিষ্ঠিত হবেন।

আপনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য যত কিছুই করতে অভিলাষী, বাস্তবিকই তার জন্য আপনাকে বাছবিচার করতে হবে না। শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য রন্ধন কার্যে আপনি মনোনিবেশ করতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে আপনি কৃষ্ণ গ্রন্থাবলী বিতরণ করতে পারেন, যা কিছু হোক না একটা সেবা সম্পাদনে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন, সেই সমস্ত কিছুই হয়ে উঠবে মহিমামণ্ডিত, যত রকমের কৃষ্ণসেবা– এমন কি শৌচাগার পরিষ্কার রাখার সেবার মধ্যে দিয়েও কৃষ্ণভক্তদের সন্তুষ্টিবিধান করে আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনে সফল হতে পারেন। এই সমস্ত সেবাই অতি গুরুত্বপূর্ণ সাধনভক্তির অঙ্গ।

আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি আমার শ্রীগুরুদেবের শৌচাগার পরিষ্কার রাখার সেবা অধিকার পেয়েছিলাম। কী পরমানন্দ লাভ করছি সেই সেবার মাধ্যমে! কারণ তার মধ্যে দিয়ে আমি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, আমি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের তথা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরেছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকে এমন সুযোগ এমন দুর্লভ অধিকার তো পায় না। তাই এইভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সুযোগ অতি অল্পজনেই লাভ করে থাকে, এবং সেই সুযোগ হেলায় হারাতে নেই কখনও।

ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগের যথার্থ মনোভাব গড়ে তুলতে হয়। সেবার দায়িত্ব পালন আর সেবার দায়িত্ব পরিচালনা, দুটিই গুরুতর বিষয়। এই দায়িত্বপূর্ণ মনোবৃত্তি সহকারেই বৈদিক যুগের জনগণ আদর্শ রাজা পৃথু মহারাজের কাছে অন্ন তথা কর্মসংস্থানের আবেদন জানিয়েছিল, সেই বর্ণনা রয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে (৪র্থ স্কন্ধ, ১৭শ অধ্যায়)।

করাতের দাঁতে দু'মুখো শাণ দেওয়া থাকে, দু'দিকে কাটে। যারা কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করতে অভিলাষী বা যারা কৃষ্ণচরণে আশ্রিত হতে অভিলাষী, তাদের প্রত্যেককেই হতে হবে সেবা অভিলাষী। যারা নেতৃত্ব গ্রহণ করতে উচ্চাভিলাষী, তাতেও কিছু যায় আসে না, তাদেরও সুন্দর পরিচ্ছন্নভাবে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করে আদর্শ স্থাপন করা চাই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঠিক তাই বলতেন দীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে। দীক্ষাগুরুকে যেমন গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে, তেমনই শিষ্যকে হতে হবে সেবা অভিলাষী। গুরুকে হতে হবে নিষ্ঠাবান, বৈদিক গুণসম্পন্ন, তাঁকে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী থেকে যথার্থভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। তাঁকে আচার্য হতে হবে। বৈদিক উপদেশাবলী অনুসারে তাঁকে সুন্দরভাবে সব কিছু করতে হবে। আচার এবং প্রচার উভয় ক্ষেত্রেই তাঁকে হতে হবে আদর্শস্থানীয়। আদর্শ আচার প্রদর্শনের মাধ্যমেই তিনি হবেন আদর্শ আচার্য। তাঁর সদ্ব্যবহার, সদাচার, শাস্ত্রাদি অনুসারী কার্যকলাপ হবে অনুসরণযোগ্য এবং সকল ক্ষেত্রে তিনি হবেন সদালাপী এবং মিষ্টভাষী।

ঠিক তেমনই যাঁরা আচার্যের প্রবচন বাণী উপদেশাবলী শ্রবণ করবেন, তাঁদেরও হতে হবে শুদ্ধ হৃদয়বান। তাঁদের বিধিবদ্ধ জীবনধারা অবলম্বন করে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। কমপক্ষে চারটি নিয়ম পালন করতে হবে এবং ঠিকমতো সংখ্যায় জপমালায় নাম জপ অভ্যাস করতে হবে।

সুতরাং এই দুই ধরনের মানুষ যখন সমবেত হবেন,

তখন সেখানে অবশ্যই এক বিস্ময়কর অনুভূতি অভিজ্ঞতার সঞ্চার হবেই হবে-সেই অভিজ্ঞতা স্বচ্ছ পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধির অভিজ্ঞতা। সেখানে গুরুদেব এবং শিষ্য উভয়েই এক দিব্য পরমানন্দের স্বাদ অনুভব করতে থাকেন। সে-এক অপ্রাকৃত সম্মিলন। সে-এক অপ্রাকৃত সম্বন্ধ। আর এমনই সম্মিলনের মাধ্যমে যেখানেই যে রকমেরই ভগবদ্‌সেবা অনুষ্ঠিত হতে থাকবে, তা মন্দিরে হোক কিংবা যেখানেই হোক, তার মধ্যে ভগবদ্ভক্তির যথার্থ মনোভাব হয়ে উঠবে কার্যকর।

আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে কোন সেবায় আত্মনিয়োগ করে থাকতে চাই, এই অভিলাষ মন্দির অধ্যক্ষ বা কর্তৃপক্ষ যিনিই হোন, যখন উপলব্ধি করবেন, তখন তাঁর কৃপায় আপনি যে কোন সেবাতেই নিয়োজিত হন, তাতে দিব্য আনন্দ অনুভব করতে থাকবেন। আপনি কোন্ সেবা করছেন, সেটা বড় কথা নয়-আপনি যে-সেবাই করুন না কেন, কতটুকু ভক্তি সহকারে তা করছেন, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। এই সেবাবৃত্তিই আমাদের কৃষ্ণ অভিমুখী করে তুলবে। সেই হল ভক্তি।

সমস্ত আয়োজনটাই এমনভাবে করা হয়েছে যাতে আমরা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্যে যথার্থ প্রস্তুতি লাভ করতে পারি। এটি এক সুনিপুণ আয়োজন। এক ধরনের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার সমাবেশ। এটি একটি কৌশল মাত্র। আপনাকে শুধু যথাযথভাবে সেই পন্থাটি গ্রহণ করে, সেই কৌশলের অ আ ক খ মেনে এগিয়ে চলতে হবে।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতে এক অতি যোগ্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ পৃথু মহারাজের কাহিনীর মাধ্যমে আমরা যথার্থ ভক্তি শিক্ষকের আদর্শ উপলব্ধি করতে পারি। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার। তাঁর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারব, তিনি কিভাবে আচরণ করেছিলেন। তা থেকে আপনারা ভক্তি শিক্ষার আদর্শের একটা দৃষ্টান্ত পাবেন। এখানে আমরা উভয় পক্ষ থেকেই দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। এমন নয় যে, যথার্থ শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াই আপনাকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হবে। আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত রয়েছে যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিরা যেইভাবে আচরণ করেছিলেন, সুফল পেতে হলে আমাকেও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। এইভাবে যদি প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করা যায়, তা হলে কেউ বলতে পারবে না যে, সে প্রতারিত হয়েছে। আমরা কতটুকু নিষ্ঠা সহকারে সেই পন্থাটি অনুশীলন করছি, তা-ই গুরুত্বপূর্ণ। পুরাকালে বহু মহাত্মা এই পন্থা অনুসরণ করে মুক্তিলাভ করেছেন। ভগবদ্ভক্ত কখনও কোনও সেবাতেই দৈহিক বা মানসিকভাবে অতৃপ্তিবোধ করেন না। ভগবদ্ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই পরম তৃপ্তি লাভ করেন। তবে ভক্তিমার্গে যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তবে নিজেদেরই অন্তর পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সমস্যাটা বাইরে নয়, অন্তরেই থাকে। অন্য কাউকে দোষারোপ করবেন না কখনও।

ভাল-মন্দ সাফল্য সমস্যা সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য আয়োজনের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সেই পরিস্থিতিতে কখন কিভাবে মানিয়ে নিতে হবে, সেটাই আমাদের শিক্ষা। যদি আমরা ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হতে থাকি এবং পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ি, তা হলে ভুলত্রুটি কিছু হয়েই থাকতে পারে। আর যদি ভক্তিমার্গে সন্তোষ বোধ করতে থাকেন, তা হলে আপনার উন্নতি হবেই। কোন সময়ে কিছু না কিছু বিঘ্নের সম্মুখীন হতেই হয়। সাধনভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সেবায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে, সেটা সহনীয় হয়ে ওঠে। সমস্যা হতেই পারে, তবু তারই মাঝে শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন হয়ে থাকা যায়। তবে সর্বদাই মনে রাখতে হবে-কোনও সমস্যা, কোনও বিঘ্নের জন্যে অন্য কাউকে দোষারোপ করা উচিত নয়।

সর্বদা মনে রাখতে হবে, আমি আমার সাধ্যমতো উন্নতি করে চলেছি। যে কোনও বিঘ্নের সম্মুখীন হলেও, মনে করতে হবে, এটা আমার অপরিণত বুদ্ধির পরিণাম। আরও দ্রুত উন্নতি করতে হলে আরও পরিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রয়োগ আবশ্যক। এটা একধরনের বিশেষ মনোভাব-কাউকে দোষারোপ নয়, অন্য কাউকে দায়ী করা নয়।

শ্রীকৃষ্ণের সাথে আপনার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। সেটাই হল পারমার্থিক জীবনধারার মূলগত দর্শনচিন্তা। সেই সম্বন্ধ চিরন্তন এবং এখন তা আবৃত হয়ে রয়েছে। কারও সাহায্যে তা অনাবৃত করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে হলে ভক্তিমার্গে থামা চলবে না। তা হলে কোন কিছুই আপনাকে আর থামিয়ে রাখতে পারবে না। তা হচ্ছে অপ্রতিহতা। সমস্তটাই নির্ভর করে আপনার অন্যাভিলাষশূন্যতা, আপনার কৃষ্ণসেবা বাসনার উপর। আর সাধন-ভক্তি আমাদের কামনাকে পবিত্র করে, আমাদের ইচ্ছাকে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে এবং আমাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

সুতরাং এই ক্ষুধার সমস্যা শুধু একটি মাত্র সমস্যা। এই রকম কতই না সমস্যা রয়েছে। এই গুলি শুধু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনতার কিছু লক্ষণ মাত্র। হরেকৃষ্ণ।

ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে ৪বছরের মোট ১৬ সংখ্যা বই আকারে বাঁধাইকৃত পাওয়া যাচ্ছে! আপনার কপিটির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
মোবাইল - ০১৯১৪৫৭৩২৯৪

আমি কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হলাম

– শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী

আমি ভারতের মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ছোট্ট গ্রাম অরবদেতে জন্মগ্রহণ করি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর আমার বাড়ির লোক আমাকে রসায়ণ বিদ্যা নিয়ে পড়া শোনার জন্য বোম্বে পাঠায়। কিন্তু তা আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

আমার বাড়ি থেকে আমার বিভিন্ন বিষয়ের উপর সতর্কতার সঙ্গে যে সব চিন্তা ভাবনা আরোপ করেছিল, ১৯৭১ সালের কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে সব রূপায়ণের থেকে আমাকে বিরত করল। সেইবারই প্রথম শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর বিদেশী ভক্তদের নিয়ে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করছেন। তাঁরা আমার আসার আগেই বোম্বে পৌঁছে গিয়েছিল এবং এর পর তাঁরা ক্রস ময়দানে প্যাণ্ডেল করে পারমার্থিক উৎসব করতে যাচ্ছিল।

ভক্তরা উৎসবটিকে লোকের নজরে আনার জন্য সংবাদ পত্র ও অন্যান্য মাধ্যমগুলির সাহায্যে ব্যাপক প্রচার চালায়। বিজ্ঞাপনে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যদের আমেরিকান, ক্যানাডিয়ান, ইউরোপিয়ান, আফ্রিকান এবং জাপানী সাধু বলে উল্লেখ করা হয়। এ সবই ছিল নজির-বিহীন। পূর্বে কাউকে 'সাধু' বলা মানেই বোঝাত যে সে একজন ভারতীয়। অন্য কাউকেই বিবেচনা করা হত না। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনে সেই সব সাধুদের কথাই বলা হয়েছিল যারা কিনা সমগ্র বিশ্ব থেকেই এসেছে। আর সত্যি বলতে কি এই বিষয়টিই ছিল বোম্বেবাসীদের কাছে অভিনব এবং এটি আমাকেও ভাবিত করে।

কৌতূহলবশত আমি হরেকৃষ্ণ উৎসবে যাই, এটি খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। কৃষ্ণভক্তদের দেখে আমি খুব আকৃষ্ট হই। তাঁদের নর্তন-কীর্তন, চলন-বলন সব কিছুই আমার ভাল লাগল। বাস্তবিকই তাঁদের সবকিছুই ছিল সুন্দর এবং প্রতি সন্ধ্যেতে আমি তাঁদের অনুষ্ঠানে যোগদান করি। আমি শুধু দেখতাম আর শুনতাম, যদিও ইংরেজি জানতাম তবুও অনর্গলভাবে বলতে পারতাম না, এবং তাই বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হত। আমার কাছে অল্প যা টাকা পয়সা ছিল তা দিয়ে পারমার্থিক কিছু ম্যাগাজিন ও বই কিনেছিলাম।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিদিন প্রবচন প্রদান করতেন। তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং এর অনেক দিক তুলে ধরতেন। কিন্তু যে দিকটি আমার উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল এবং অন্য সব ব্যতিরেকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল, সেটি হল সহজ একটি দিক–তুমি যদি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবা কর, তবে তুমি একইসাথে সকলের ও সব কিছুরই সেবা কর, তবে তুমি একইসাথে সকলের ও সব কিছুরই সেবা করছ। শ্রীল প্রভুপাদ বৃক্ষ-মূলে জল দেওয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন বৃক্ষ-মূলে জল দিলে এর শাখা-প্রশাখা, ফুল ফল সমস্ত কিছুতেই জল দেওয়া হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ আমার কাজটিকে সহজ করে দিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম এই আমার সুযোগ। আমি সর্বদা অন্য দের সেবা করতে চাইতাম এবং তা ছিল আমার জীবনের বিভিন্ন সময়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র অথবা আইনজ্ঞ হওয়া চিন্তার মধ্যে দিয়ে। যখনই আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছি তখনই অন্যদের আমি কিভাবে সেবা করতে পারব এ কথাই মনে আসত। তথাপি অতিবাহিত ঐ বছরগুলিতে আমি চাকরির বিষয় নিয়েই ভেবেছি। আমি জানতাম না কোথায় কিভাবে কি শুরু করব কারণ বাস্তবিকই আমার জীবিকার কোন সংস্থান ছিল না। কিন্তু এর পর শ্রীল প্রভুপাদ আমার পথকে খুব সহজ করে দিয়েছিলেন– সর্ব কারণের কারণ পরমেশ্বরের সেবার মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিকে সেবার কথা বলে। এটি

আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে।

নির্ধারিত ১১ দিন পর হরেকৃষ্ণ উৎসব শেষ হয় এবং এরপর থেকে আমার সব কিছুই পুনরায় গতানুগতিক ধারায় চলতে লাগল। যথারীতি আমি বোম্বের কলেজে যাতায়াত শুরু করে দিলাম। আমি আমার গ্রামের কয়েক জনের সাথে ভাগাভাগি করে একটি ঘরে থাকতে লাগলাম। যাদের সাথে আমি থাকতাম তাদের আমার উপর নজরদারি থাকত এবং তা আমার বাড়ির লোকেদের কথামত। কারণ এক সময় এর অনেক বছর আগে একবার আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আমার গ্রামের কাছেই অবস্থিত একটি শহরের আশ্রমে যোগ দেই। আমি সেখানেই অতিবাহিত করব মনস্থ করেছিলাম কিন্তু পরমেশ্বরের অদৃশ্য, অকৃপণ হাত আমাকে এ যাত্রা থেকে রক্ষা করেছিল আর সে কারণেই পরে শ্রীল প্রভুপাদের ইসকনে আমি যোগদান করতে পেরেছিলাম। এই ঘটনার পরে আমার বাড়ির লোকেরা ভেবে নিয়েছিল যে আমি কোনও সময় কোথাও চলে যেতে পারি তাই তারা আমার গ্রামের লোকদের আমার উপর নজর রাখতে বলেছিল। কিন্তু কতক্ষণই বা তারা আমাকে লক্ষ্য রাখবে? আমি প্রতি সন্ধ্যাতে হরেকৃষ্ণ-উৎসব অনুষ্ঠানে যেতাম এবং তা কেউ লক্ষ্য করতে পারে নি। আমি আমার প্রকাণ্ড রসায়ণ বইটার ভিতরে হরেকৃষ্ণ পত্র পত্রিকা, বই ইত্যাদি রেখে দিতাম এবং ঘন্টার পর ঘন্টা তা পড়তাম। আমার ঘরের সঙ্গীরা ভাবত নিবিষ্টমনে আমি কতই না রসায়ণ বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছি।

আমি যে তখন রাসায়নিক বিশ্লেষণের নীরস বিষয়ের চেয়ে মানব জীবনের উদ্দেশ্যে বিষয়ে নিমগ্ন এ তারা নির্ধারণ করতে পারত না। যখন আমার সঙ্গীরা বাইরে যেত তখন আমি দরজা বন্ধ করে দিতাম ও পুরোদমে উদ্বাহু হয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতাম। উৎসব মঞ্চে ভক্তদের নর্তন-কীর্তন দেখে আমিও তাদের অনুকরণের চেষ্টা করতাম। এভাবে লুকিয়ে নর্তন-কীর্তন করি, তাছাড়া কাছে যে ক'খানি বই ছিল তা বার বার পড়ে আমি কৃষ্ণভাবনামৃতের ভাবধারায় ভাবিত হওয়ার পথ অনুসরণ করছিলাম।

কৃষ্ণভক্তরা যে বোম্বেরেই কোন জায়গায় থাকে এ কথা আমি জানতাম কিন্তু উৎসবের পর তাঁদের ছোট দলটি যে এত বড় শহরের কোথায় মিশে গেল তা আর বুঝতে পারলাম না। ফলে তাঁদের সঙ্গলাভে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

এর পর বছর খানের অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ইসকন আর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, এবার তা জুহু বীচে (বোম্বে)। সে বছর ভক্তরা জুহু-তে কিছু জায়গা কিনেছে এবং সেখানেই অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ঠিক আগের মতই সংবাদপত্রে ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলিতে এ অনুষ্ঠানের প্রচার করা হয়। পরমেশ্বরের কারণাতীত কৃপায় এ খবর আমার কাছেও এসে পৌঁছল। আমি এরকমই একটা সুসংবাদের প্রতীক্ষাতেই ছিলাম এবং তা শুনে যারপরনাই খুশি হই।

স্বভাবতই আমি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হই। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই আমি তাঁদের পারমার্থিক বই ধার করে পড়ে ফেলি। মনপ্রাণ সমর্পণ করে নাম সংকীর্তনে আমিও যোগ দিই। বিদেশী ভক্তরা ভারতীয় পোশাকে (ধুতি,পাঞ্জাবি) এবং ভারতীয় ছাত্ররা ওদেশীয় পোশাকে (ট্রাউজার্স এবং সার্ট) হরিনাম সংকীর্তনে একত্রে নৃত্য করত।

কখনও কখনও মহাপ্রসাদের সময় যখন আমি গেটের কাছে আসতাম তখন ভক্তরা আমাকে আমন্ত্রণ জানাত এবং প্রসাদ গ্রহণের জন্য বলত। আমি খুব নিবিড়ভাবে তাঁদের জীবনযাত্রা নিরীক্ষণের জন্য উৎসুক ছিলাম। তাই আমি তাঁদের সঙ্গে যোগদান করে এ সুযোগ গ্রহণ করতাম। আমি দেখেছি যে তাঁরা সত্যিই অপূর্ব সর্বোপরি তাঁরা বিদেশী এবং আমি স্বভাবতই আভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

জুহু উৎসব শেষ হওয়ার কয়েকদিন পর আমি ইসকনের সদস্য পদের জন্য উৎসুক হয়ে পড়ি। আমি ভক্ত-সঙ্গের জন্য যে কোন বিভাগেই যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলাম। আর আমি জানতাম সদস্য পদের দরখাস্ত পূরণের জন্য একজনের প্রয়োজন। এরপর দরখাস্ত পূরণ করে তা বোম্বে ইসকন কেন্দ্রের প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিই। ওটি-তে লিখেছিলাম, আমিষাহার বর্জন, মাদক বর্জন, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন, তাস-জুয়া-পাশা খেলা বর্জন, এই চারটি নির্দেশিত নিয়ম-নীতি আমি মানতে রাজি। আমি আরও উল্লেখ করেছিলাম যে আমি তাঁদের মনোরম আরতি, দিব্য-সংকীর্তন এবং অমৃতময় কৃষ্ণ প্রসাদ খুবই পছন্দ করি (আমি এ সব পারমার্থিক শব্দ তাঁদের প্রচার মাধ্যমগুলির দ্বারাই রপ্ত করি)। টাইপ স্কুলে গিয়ে আমি আমার দরখাস্ত টাইপ করেছিলাম, ইসকন যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তাই আমি সমস্ত কিছুই যথাযথভাবে করেছিলাম।

এরপর আমি জুহুর হরেকৃষ্ণ মন্দিরে যাই এবং প্রেসিডেন্টের খোঁজ করি। তাঁর দেখা পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। তিনি হলেন গিরিরাজ দাস। দরখাস্তের বিষয় অবগত করার পর তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন

এবং ওখানেই জড়িয়ে ধরলেন, এবং শুধু তাই নয় অভ্যর্থনা করার পর তিনি আশ্রমের অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে আমাকে নতুন ভক্ত হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এর পর নতুন জীবন ধারার সাথে আমি খুব তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নিলাম। আমার ছিল নতুন ঘর, পোশাক, ভক্তসঙ্গ আর নতুন কাজ—প্রায় সবকিছুই আমার কাছে নতুন ছিল। তা সত্ত্বেও আমি সব কিছুই সাদরে বরণ করলাম এবং পছন্দ করাও শুরু করলাম। যদিও ভক্তরা প্রায় সকলেই বিদেশী তবু সেখানে আমি নিজের বাড়ির মতই বোধ করতাম। আমি এ সব কিছুই জীবনে বাস্তবায়িত করবার জন্য দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম।

এর পর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হল। এমন সময় আমার দাদা আমারই পুরণো ঘর-সঙ্গী নিয়ে মন্দিরে আসে। আমি সেখান থেকে যখন আসি তখন সেই ঘরটিতে কিছু হ্যাণ্ডবিল ফেলে আসি এবং ওতেই তারা জুহুর ঠিকানা পেয়ে যায়। এভাবে তারা আমার খোঁজ পায়। আমি যে ভক্তসঙ্গে যোগদান করব এটা তাদের কাছে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। এরকমই যে কিছু একটা হবে তা তারা আশা করে আসছিল কিছুদিন থেকেই এবং এখন তাদের অন্য ভয়-আশঙ্কা দূরীভূত হল।

আমার দাদা চাইছিল যে আমাদের পরিবারের বিশেষ করে মা'কে একবার দেখা দেবার জন্য যেন আমি একবার গৃহে যাই। তিনি বলেছিলেন যে আমি যদি না যাই তবে মা মারা যেতে পারে। মাকে দেখে এখানে ফিরে আসার ব্যাপারে পরিবার থেকে কোন বাধা দেওয়া হবে না তিনি এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। আমি আমার দাদাকে মর্যাদা দিতাম, আর এখানে বাস্তবিকই তিনি আমার একবার বাড়ি যাওয়ার জন্যে খুবই কাকুতি মিনতিই করছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন যে এটা স্নেহময়ী মা'র জীবন-মরণের সমস্যা। অবশেষে আমি গিরিরাজ মহারাজের কাছে বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি নিই এবং এখানকার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে মন্দির থেকে রওনা হয়ে যাই।

তারপর আমি আমার গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানকার লোকেরা আমাকে দেখে বলতে লাগল যে আমি যদিও একজন ভাল ছেলে তবু আমার এই হঠাৎ পরিবর্তনে কিছু একটা ঘটে গিয়ে থাকবে। এর কারণও ছিল। কারণ আমার পরিধেয় বস্ত্র ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছিলাম আর অভক্তদের সঙ্গ পরিহার করে চলছিলাম। এসব কিছুই তাদের কাছে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।

যদিও আমার বাবা আমার মত বস্ত্র পরিধান করতেন এবং তিলক লাগাতেন তথাপি আমি নিজে যাতে সে-সব না করি তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বাবা ভগবান বিঠ্ঠলের একজন ভক্ত ছিলেন, ভগবান বিঠ্ঠল ভগবান বিষ্ণু অথবা শ্রীকৃষ্ণেরই আর একটি রূপ বলে কথিত। আর বিঠ্ঠল ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণভক্তদের মতই তিলক কাটত। আমার বাবা বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিলক কাটতেন; কিন্তু তিনি চাইতেন না যে আমি ওসব করি, কারণ লোকেরা কিছু ভাবতে পারে (ভারতীয় পিতা-মাতাদেরই যদি ও রকম প্রতিক্রিয়া হয় তবে ভিনদেশীয়দের যে কি রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এ আমি কল্পনা করতে পারি না।)

এইভাবে আমার বাবা সর্বত চেষ্টা করেছিল আমি যাতে কৃষ্ণভক্তদের কাছে আর না যাই। এমন কি তারা জ্যোতিষীদের কাছে এর কোন প্রতিকারের উপায় আছে কিনা এবং আর কতদিনই বা আমি এই বিচিত্র জীবন অতিবাহিত করব তা জানার জন্য তাদের কাছে গিয়েছিল। বাস্তবিকই তারা নিরাশ হয়েছিল।

এক সপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পরেও ভক্তদের কাছে ফিরে যাওয়ার কোন বন্দোবস্ত হল না। অথচ আমার ও দাদার মধ্যে এ রকমই কথা হয়েছিল। আমার বাবা বলতে লাগলেন যে আরও কিছু আত্মীয়-স্বজন আমাকে দেখতে আসবে, তাদের সঙ্গে দেখা না করে আমার ফিরে যাওয়া অনুচিত হবে। আসলে ভক্তসঙ্গের ব্যাপারে তাদের দ্বারা আমাকে নিরাশ করার মতলব আঁটা হয়েছিল। বাবা আমাকে ফিরাতে চেয়েছিল কিন্তু ততদিনে কৃষ্ণভক্তদের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমার মন তৈরি হয়ে আছে।

একদিন আমার বোনকে কান্নাকাটি করতে দেখলাম। কি হয়েছে এ কথা কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল, 'দেখো' আমাদের বাড়ির ছেলেরা কি সুন্দর সকলে মিলে তাস খেলছে অথচ আমার ভাই রঘুনাথ ওদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলছে।'—এটাই ছিল তার কান্নার কারণ। তাস খেলার পরিবর্তে জপ মালায় আমাকে জপ করতে দেখার কারণই এই দুঃখের কারণ।

যখন আমার বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারল যে আমি যে জীবন আঁকড়িয়ে ধরেছি তা কিছুতেই ছাড়ব না তখন তারা নিরাশ হয়ে আমাকে একটি প্রস্তাব দিল। প্রস্তাবটি হচ্ছে যে আমি এ 'সাধু'-র জীবন অতিবাহিত করতে পারি কিন্তু তা ঐ গ্রামে থেকেই। ওখানে থেকেই যাতে আমি ভজন-কীর্তন করতে পারি সে জন্য তারা সেখানে একটি মন্দির করে দেবারও প্রস্তাব দেয়। আমি এ প্রস্তাবও প্রত্যাখান করি কারণ আমি কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গই চাইছিলাম যারা অহোরাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনে নিমগ্ন, সে-সব ভক্তসঙ্গ ছাড়া পারমার্থিক জীবন অতিবাহিত করার কোন

প্রশ্নই আসে না। আমি কখনই একজন ভন্ড সন্ন্যাসী হতে চাইনি। ভারতবর্ষ এমনিতেই এ ধরনের সাধু-সন্ততে ভ'রে গেছে। আমি হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে শ্রীকৃষ্ণের সেবার মধ্যেই ডুবে যেতে চেয়েছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ সেই পথকে আমার কাছে সুগম করে দিয়েছিলেন। তিনি জীবনের উদ্দেশ্য পরিস্কার করে দিয়েছিলেন এবং এ কারণে চিরদিনের জন্য আমি পরিতৃপ্তও বটে।

আমি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তা ছাড়া শ্রীল প্রভুপাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম, অবশেষে তাই বাড়ির লোকেরাও বাস্তবতারকে মেনে নিল। আমি একমাস পরে বোম্বেতে ফিরে এলাম এবং পুনরায় আশ্রমে ফিরে গেলাম। কিছু বেশি সময় গ্রামের বাড়িতে থাকার পর আমার এই ফিরে আসা গিরিরাজ মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তরা কি ভাবে নেবে সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম না। আমি অবাক হলাম যখন দেখলাম যে তাঁরা ঠিক আগের মতই আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে– আসলে তাঁরাই আমাকে তাঁদের মধ্যে দেখে অবাক হয়। এর কারণও ছিল– তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে বাড়ি যাওয়ার সময় অধিকাংশ ভারতীয় ভক্তই আশ্রমে ফিরে আসবে এ প্রতিশ্রুতি দিলেও কিন্তু বাড়ি থেকে তারা আর ফিরে আসে নি। আর এ কারণেই আমাকে ফিরতে দেখে তাঁরা অবাক হল এবং সঙ্গে খুশিও হল। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপাশীর্বাদের ফলেই আমার ভক্তসঙ্গে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছিল।

পরের ঘটনা

এটা ঠিকই যে ইসকনে যোগদান করাতে প্রথম দিকে আমার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল এবং আমার ছোট্ট গ্রামটাই প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এটাও ঠিক যে সে সবই ছিল অনর্থক ও অস্থায়ী। ইস্‌কনে আসার পর আমি ভক্তসঙ্গে এখন প্রায়ই আমার গ্রাম অরবদেতে যাই এবং সেখানে গিয়ে লোকেদের কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করি। আর আমার বাড়ি ও সমস্ত গ্রামের মানুষ এমন ধর্মীয় আন্দোলনের অগ্রদূত ইসকনকে সাদরে বরণ করেছে। সেখানকার সাত সাতজন পূর্ণরূপে ভক্ত-জীবন যাপন করছে। আরও আশ্চর্য যে আমার বোন তার ছেলেকে বৃন্দাবনের ইসকন গুরুকুল বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছে এবং আমার বাবার সঙ্গে আমার যখনই দেখা হয় তখনই তিনি তিলক কাটার কথা বলেন এবং খুব গর্ব ভরে তাঁর ললাট রঞ্জিত করেন। এছাড়া আমার বাড়ির লোকেরা এবং অরবদের গ্রামের অনেক পরিবার নিয়মিতভাবে জপমালায় জপ করে থাকে। মোটকথা গ্রামের মানুষ কোনও রকম সংশয়, বাদবিসম্বাদে না গিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতকে সাদরে গ্রহণ করেছে।

সুবর্ণ সুযোগ!   নতুন ভক্ত প্রশিক্ষণ   সুবর্ণ সুযোগ!!!

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (গীতা ১৮/৬৬)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন যে, সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।

ইস্‌কন স্বামীবাগ আশ্রম পরিচালিত "নতুন ভক্ত প্রশিক্ষণ বিভাগ" সনাতন ধর্ম প্রচারে ইচ্ছুক যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইস্‌কন এর বিশ্বব্যাপী প্রচার পরিক্রমায় স্ব-স্ব প্রতিভাকে বিকশিত করে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকে আরো বেগবান করার জন্য আপনার সহযোগিতা অবশ্যক।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥ (চৈঃ চঃ আদি ৯/৪১)

তাই আপনিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে যোগদান করে নিজের দূর্লভ মনুষ্য জীবনকে সার্থক করতঃ সমাজের প্রভুত কল্যাণ সাধন করুন।

ভর্তির যোগ্যতা ঃ ক. নূন্যতম মাধ্যমিক পাশ খ. বয়সঃ ১৮-৩০বছর পর্যন্ত, গ. অবিবাহিত হতে হবে ঘ. ভোটার আই ডি কার্ড, চেয়ারম্যান বা কমিশনারের সার্টিফিকেট সহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

যোগাযোগ

নতুন ভক্ত প্রশিক্ষণ বিভাগ

স্বামীবাগ আশ্রম, ৭৯ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০, রুম নং- ১৫, ফোনঃ ৭১২২৪৮৮, মোবাইলঃ ০১৯২১৪৮৪৬৪৭

শ্রীশ্রী রথযাত্রা উৎসব

– শ্রী সুখী সুশীল দাস ব্রহ্মচারী

এই জগতে ভগবান প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রূপধারণ করে আর্বিভূত হন। কখনও মৎস্য, কখনও বরাহ, কূর্ম বা নৃসিংহ ইত্যাদি রূপে। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত করুণাময় রূপটি শ্রী জগন্নাথ রূপ।

প্রণাম মন্ত্র

নীলা চলনিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং শ্রী জগন্নাথায় তে নমঃ

পরমাত্মা স্বরূপ যাঁরা নিত্যকাল-নীলাচলে বসবাস করেন, সেই বলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেবকে প্রণতি নিবেদন করি।

জগন্নাথকে?

যেই গৌর, সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ। ভগবান জগন্নাথদেব হলেন– শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যিনি জগতের নাথ বা জগদীশ্বর রূপে প্রকাশিত। সংস্কৃত ভাষায় জগৎ অর্থে বিশ্ব এবং নাথ অর্থে ঈশ্বর। সুতরাং জগন্নাথ শব্দের অর্থ হল জগতের ঈশ্বর বা জগদীশ্বর।

রথরূঢ়োগচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃসকল-জগতাং সিন্ধু-সদয়ো
জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতুমে।।

রথে আরোহন ক'রে গমন করতে থাকলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মনগণ যাঁর স্তব করতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করে যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় তদাপকূলে বিরাজ করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

জগন্নাথের কেন এই রূপ?

সময়টি ছিল ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্ধের সত্যযুগ। সেই সময় শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সূর্যবংশীয় রাজা যিনি ছিলেন পরম বিষ্ণু ভক্ত, মালব দেশের অবন্তীনগরীতে রাজত্ব করতেন, বর্তমানে স্থানটি ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে পুরীধাম নামে পরিচিত। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। এমনমুহূর্তে ভগবৎপ্রেরিত কোন এক বৈষ্ণব ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নীলমাধব ভগবানের কথা প্রকাশ করলেন যে, নীলাদ্রী পর্বতে নীল মাধব এক সবর রাজার নিকট সেবিত হইতেছেন।

রাজপুরোহিত শ্রীবিদ্যাপাতকে যিনি এই নীলমাধবের সন্ধান পেলেন। নীল মাধবের সন্ধান লাভ করিয়া তাঁর আর আনন্দের সীমা রহিল না। হঠাৎ সবর রাজ বিশ্বাবসু নীলমাধবের দৈব্যবাণী শ্রবণ করলেন যে "আমি এতদিন তোমার প্রদত্ত বনফুল ও বনফল গ্রহন করেছি। এখন আমার ভক্ত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের প্রদত্ত রাজ সেবা গ্রহণের অভিলাষ হয়েছে।

এদিকে রাজা বিদ্যাপতির নিকট নীলমাধবের বার্তা শ্রবণ করিয়া বহু লোকজন লইয়া শ্রীনীলমাধবকে আনয়ণ করিবার জন্য অভিলাষ করিলেন। কিন্তু সেখানে উপনিত হইয়া নীলমাধবকে দর্শন না পাইনা সবর রাজ বিশ্বাবসুকে বন্দী করিলেন। হঠাৎ আকাশবাণী হইল, শবর রাজকে ছাড়িয়া দাও নীলাদ্রীব উপর দারুব্রহ্ম রূপে আমার দর্শন পাইবে। নীল মাধব রূপে আমার দর্শন পাইবেনা। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নীলমাধবের দর্শন না পাইয়া অনশন ব্রত অবলম্বন পূর্বক প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলেন, তখন শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে বলিলেন। "তুমি চিন্তা করিও না, আমি দারুব্রহ্মার রূপে সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে চক্রতীর্থের সন্নিকটে উপস্থিত হইব।" রাজা সেই দারুব্রহ্মকে আনিতে তথার উপস্থিত হইলেন কিন্তু দারুব্রহ্মকে উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন

স্বপ্নে জানিতে পারিলেন–"আমার পূর্ব সেবক বিশ্বাবসু যিনি আমার নীলমাধব রূপে পূজা করিতেন, তাঁহাকে এখানে আনয়ণ কর এবং একটি সুর্বণরথ দারুব্রহ্মের সম্মূখে স্থাপন কর" বিশ্বাবসু রাজা এসে একপার্শ্ব ধারণ ও অন্য ভক্তগণ অপর পার্শ্বধারণ করিলেন এবং চতুর্দিকে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে দ্বারুব্রহ্মকে রথোপরি আহোরণ করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা দারুব্রহ্মকে মুর্ত্তিতে প্রকট করিবার জন্য বহু দক্ষ শিল্পীকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাহারা কেই*****

বিগ্রহঃ এক সময় ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগন্নাথ বরদিতে চাইলেন। কিন্তু রাজা অপুত্রক হওয়ার বর চাইলেন, ভবিষ্যতে যাহাতে জগন্নাথ মন্দিরের সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে কেহই বিবাধ করিতে না পারে। কিন্তু রানীগুন্ডিচা বললেন অপুত্রক করলে কে আমাদের সৎকার করবে।****

ভগবান জগন্নাথদেব বললেন "আমি তোমাদের পুত্ররূপে আছি; প্রতিবছর আমার মন্দির থেকে এসে তোমার এই মন্দিরে ৭ (সাত) দিন থাকবে।

রথযাত্রার আর একটি কারণ রহিয়াছে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভৌমলীলা বৃন্দাবনে এগারো বছর পর্যন্ত থাকার পর মথুরায় চলে যান, তারপর দ্বারকায়। এভাবে একশত বছর অতিবাহিত হল; এদিকে কৃষ্ণ বিরঙ্গে ব্রজ বাসীবাসীরা অত্যন্ত কাতর পড়েন। এসময় সূর্যগ্রহণ কালে সমস্ত দ্বারকাবাসী, মথুরাবাসী, বৃন্দাবনবাসী হস্তিনাপুরবাসী সকলে স্যমন্তপঞ্চকে স্নান করতে যান। সেখানে রাধারাণী ও অন্যান্য গোপীকান কৃষ্ণকে স্নান দেখতে পান। তাঁরা কৃষ্ণের এই রাজবেশ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁরা কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের বংশীধারী গোপ রাখাল বালক রূপেই দেখিতে চাইলেন। অত্যন্ত আকুল আগ্রহে ব্যথাতুর রাধারাণী ও তাঁর সখীগণ রথে করিয়া বৃন্দাবনের দিকে টেনে নিয়ে যাইতে চেষ্টা করিলেন। সেই ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তগণকে সংঙ্গে নিয়ে রথের সম্মুখে সংকীর্ত্তনসহ ভগবান জগন্নাথদেবকে রথপরি স্থাপন করিয়া টানিয়া নিয়ে চলেন। ভক্তগণ সেই রথের সম্মুখে ঝাড়ু দ্বারা রাস্তাপরি সমস্ত ধুলি-কণা পরিস্কার করিয়া থাকেন। যাহার মাধ্যমে হৃদয়ের সমস্ত কুলোষতা বিদুরিত হইয়া থাকে। সাতদিন পর আবার রথকে টেনে নিয়ে আসা হয় তাঁহাকে উল্টো রথযাত্রা বলিয়া থাকে।

*** আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রথযাত্রা উৎসব।

শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও শুভদ্রাদেবীর রথযাত্রা ভারতের পুরীধামে অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্ত্তি শ্রীল অভয় চরণারবৃন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৯৬৭ সালের ৯ জুলাই আমেরিকায় সানফ্রানসিসকো শহরের রাজপথে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, সে উৎসবে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ রথের সম্মুখে নৃত্য কীর্ত্তন করে ও জগন্নাথদেবকে দর্শন করে পরম শান্তি অনুভব করে। পরবর্তিতে বিভিন্ন দেশে এই রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়– নিউইর্য়ক, লসঅ্যাঞ্জেল, লন্ডন, প্যারিস, রোম জুরিখে, সিডনিতে, ভ্যাঙ্কুভাব, টরেন্টো, মনট্রিয়েল, ওয়াদালাজারা রিওদা, জ্যারিয়েরো, মসকো, ব্রাজিল, সিকাগো, আর্জেন্টিনাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলোতে ....

বাংলাদেশে যদিও রথযাত্রা উৎসব বহুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় বর্ণাঢ্য উৎসব এবং বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, বর্তমানে ইসকন কর্তৃক আয়োজিত রথযাত্রা উৎসব সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবে রূপ নিয়েছে। যেখানে শ্রীশ্রী জগন্নাথ পুরীধাম যেরূপ তিনটি রথে করে বিগ্রহগণ নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক এই ঢাকা স্বামীবাগ রথযাত্রায় ও তিনটি সুবিশাল রথে বিগ্রহগণকে নিয়ে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ নৃত্য কীর্ত্তন ও রথের রশিধনে টেনে জগন্নাথ দেবের এই রথকে ঢাকেশ্বরীর জাতীয় মন্দিরে নিয়ে যায়। এই উৎসবে থাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বৈদিক যজ্ঞ, বিশ্বশান্তি কামনায় ভাগবতপাঠ, পদাবলী কীর্ত্তন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি যেখানে দেশবিদেশ থেকে হাজার হাজার ভক্তসমাগম ঘটে।

এই রথযাত্রা উৎসব একটি জাতী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উৎসব, যেখানে সকলকে একত্রিত হয়ে মিলেমিশে সহবস্থানের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের শিক্ষা প্রদান করে। ভক্তগণ যেখানে পরম আনন্দ অনুভব করে। এবং প্রার্থনা করতে থাকে "জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগ্রামী ভবতু: মে:। পৃথিবীর সকল মানুষ শান্তি লক্ষ করুক।

এই উৎসব একটি জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে।
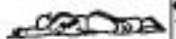
তারুণ্যে কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব

[Source: A lecture on " Why Accept Krishna Consciousness in Youth? " given by H. G. Gauranga Das (26th July 2002) published in " REVIVAL " by Gaur Gopala Das]

-ভাষান্তর- মীনাক্ষী রাধিকা দেবী দাসী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

মৃত্যুঃ সকলের জন্যই সমান

প্রত্যেককেই এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে যে- মৃত্যু যে কারো জীবনে, যে কোন মুহূর্তেই আসতে পারে। মানুষ সম অধিকারের জন্য যুদ্ধ করছে, কিন্তু এটা একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমেই দেয়া হয়ে থাকে। প্রত্যেকের জন্য সমান অধিকার, "প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে।" অতএব, আমাদেরকে এই বিষয়টি মূল্যায়ন করতে হবে যে, আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় নেই। মৃত্যু যে কোন সময় চলে আসবে এবং এই মূল্যবান মনুষ্য জীবনটা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই, প্রত্যেকটি মুহূর্তই দামী। এই পরিসরে যদি আমরা আমাদের এই জীবনকে কৃষ্ণভাবনার জন্য প্রদান করে একে কার্যকর করে তুলি তবে আমরা জয়ী হব। আর যদি অনিত্য দেহের ক্ষণস্থায়ী সুখানুসন্ধানে তাকে ব্যয় করি তবে আমরা সব কিছুই হারাব।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি কোম্পানী নতুন বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন বের করল, "এই কোম্পানীতে বিনিয়োগ করুন। আমরা আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এই শেয়ারটা ক্রয় করার এক বছরের মধ্যে এই কোম্পানী ধ্বংস হয়ে যাবে। এক বছরের মধ্যে আমরা সব কিছু বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি, দয়া করে এই শেয়ারটা কিনুন। " এই শেয়ার গুলো ক' জন কিনবে? একমাত্র কিছু প্রকৃত পাগলই এই শেয়ারগুলো কিনবে। কেন? কারন তারা ইতোমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে যে- কোম্পানীটি বন্ধ হতে চলেছে।

একইভাবে, ক' জনার এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যে, এ দেহটি নির্জীব (ধ্বংস) হতে চলেছে। এই দেহটির চরম পরিণতি হচ্ছে- ধ্বংস। আর যে ধরনের প্রচেষ্টাই আমরা করিনা কেন একে রক্ষা করার জন্য, সেগুলোর চরম পরিণতি হচ্ছে ব্যর্থতা। কাজেই মৃত্যু যে কোন সময় আসতে পারে এবং আমাদেরকে মৃত্যুর মতো এই বড় সমস্যাটিকে প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অতএব প্রথম বিষয়টি হচ্ছে- মৃত্যু যে কোন সময় আসতে পারে এবং আমরা তা জানিনা কখন?- আজকে, আগামীকাল অথবা কয়েক সপ্তাহ পর। কিন্তু জড় চেতনার এমনই স্বভাব যে- মৃত্যু সম্পর্কে পড়া-শোনা এবং চারদিকে তা দেখা সত্ত্বেও আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং নিরুদ্বিগ্নভাবে থাকি। আমরা ভাবি যে, আমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিছু ঘটতে পারে। আমি একটি সুযোগ পেতে পারি। যখন মৃত্যুর দূত আমার কাছে আসবে, আমি আবেদন জানাব। অথবা আমি মামলায় লড়ব, ওকালতি করব। কিন্তু এটা একটা ব্যর্থ প্রয়াস। যখন মৃত্যু আসে, কেউ তাকে পন্ড করতে পারে না। কাজেই জীবন সীমিত পরিসরের। যে কোন মুহূর্তে আমরা এই জীবন হারিয়ে ফেলতে পারি। তাই যত শীঘ্র সম্ভব এই পথ অবলম্বন করা উচিত। যে কটি বছরই আমাদের হাতে থাকুক না কেন, যে কটি মুহূর্ত কিংবা যেটুকু সময়, তার সবটাই দামী। এটা কখনোই মনে করা উচিত নয় যে- "এখন আমি সবকিছুই সহজভাবে নেব আর যখন বৃদ্ধ হব তখন সচেতন হব", কারণ যে কোন সময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে!

সব ইচ্ছা পূরণ করতে দিনঃ

জনৈক ব্যক্তির মতে "এমনকি দার্শনিকভাবেও এটা বোঝানো হয়ে থাকে যে, জড় বাসনাগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী- এটা মানুষের অভ্যন্তর থেকে সবসময় চাপ দিতে থাকে। এটা অনেকটা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো যা প্রতি মুহূর্তে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। কেউ হয়ত মনে করতে পারে, প্রথমে আমাদের ইচ্ছা বা বাসনা গুলোকে পূরণ করতে হবে, এরপর যখন সেগুলো সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাবে তখন আমি এই পথ গ্রহণ করব। যেহেতু আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থায় অনুশীলন করতে চাই এবং আমাদের মনটা এখন শান্ত নয়, সুতরাং আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা কোন তরুণীকে দেখি তখন আমরা আকর্ষণ অনুভব করি, তাহলে কেন আমরা কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করব? বরং আমাদের উচিত প্রকৃতিগত বা স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করা। যখন আমাদের ধুমপান করতে ইচ্ছা করে তখন আমাদের উচিত ধুমপান করা। যখন আমাদের জুয়া খেলতে ইচ্ছা করে তখন আমাদের উচিত জুয়া খেলা। সুতরাং যে ধরনের বাসনারই উদয় হোক না কেন আমাদের উচিত প্রথমে সেগুলো পূরণ করা এবং জীবনের একটা পর্যায়ে এসে যখন সব বাসনা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করব।"

এই যে জড় বাসনার চরিতার্থতা অতঃপর স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ, এটা কোন দিনই ঘটবে না। কেন? কারণ জড় বাসনা কখনোই আপনা

আপনি শেষ হয়ে যায় না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন, " প্রিয় অর্জুন! যতক্ষণ পর্যন্ত জড় কামময় বাসনা গুলো পূরণ করা হবে, মনে করো না যে এক সময় সেগুলো শেষ হয়ে যাবে। আমরা যতই আমাদের বাসনা পূরণের চেষ্টা করব সেগুলো ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে।" এখন এই বাসনা গুলো ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের মতো থাকতে পারে। যদি আমরা তাতে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পেট্রোল ঢালি, তাহলে এটা এক সময় জ্বলন্ত অগ্নিতে পরিণত হবে আর জড় বাসনার এইরূপ বিশাল অগ্নিকাণ্ড একদা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আমাদের সমস্ত সম্পদ দিয়েও আমরা আর তাকে নিভাতে পারব না। তখন ফায়ার ব্রিগেড বা দমকল ডাকার ক্ষেত্রে অনেক দেরী হয়ে যাবে। অতএব জড় বাসনার প্রকৃতি হচ্ছে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা কমে যায় না বরং আরো বাড়তে থাকে। আমাদের এটা কখনোই ভাবা উচিত নয় যে, এখন ২০ বছর বয়সে যখন আমরা একটি যুবতী মেয়েকে দেখি তখন আমরা তার প্রতি আকৃষ্ট হই কিন্তু আমাদের বয়স যখন ৬০ বছর হবে, তখন যদি আমরা একটি যুবতী মেয়েকে দেখি তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নিকট একজন পূজনীয়া রমণী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। যেসব বাসনা আমরা ১৮ বছরের যুবকের মধ্যে দেখতে পাই, ঠিক একই রকমের বাসনা আমরা ৮০ বছরের বৃদ্ধের মধ্যেও দেখতে পাই। এমনকি তার মধ্যে আরো বেশীও থাকতে পারে এবং জীবনের এই পর্যায়ে এসে সে আরো বেশী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যেহেতু সে সেই বাসনা গুলো পূরণে অক্ষম।

৮০ বছরের বৃদ্ধের এই বিব্রতকর পরিস্থিতিটা কল্পনার মাধ্যমে আমরা অনুভব করতে পারি। এ ব্যাপারে আমরা এখন কিছু উদাহরণ দেখবঃ

উদাহরণ ১ ঃ শ্রীপাদ শংকরাচার্য বলেছেনঃ

অঙ্গম গলিতম্ পলিতম্ মুণ্ডম
দশনবিহীনম্ জাতম্ তুণ্ডম।
বৃদ্ধ যাতি গৃহীত্বা দণ্ডম্
তদপি ন মুঞ্চতি আশা পিণ্ডম ।।

তিনি বৃদ্ধ বয়সে একজন ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অঙ্গম্ গলিতম্- দেহের সবগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গলে (নরম হয়ে) গেছে। একটি মোমবাতির মতো। একটি নতুন তাজা মোম, দেখতে কত সুন্দর। এই মোমটা জ্বলে গলে যাওয়ার পর কেমন বিশ্রী দেখায় ? আপনি শুধু তা কল্পনাই করতে পারেন কিন্তু এর মাথা কোন্‌টি আর তলদেশ কোন্‌টি তা আর খুঁজে পাবেন না। পলিতম মুণ্ডম- মাথার সব চুল, যা কিনা যৌবনাবস্থায় ছিল অগণিত আর এখন বৃদ্ধাবস্থায় তা সহজেই গুণা যাচ্ছে। দশনবিহীনম জাতম তুণ্ডম- যৌবনের শুরুতে দাঁতের সংখ্যা থাকে ৩২। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই সংখ্যাটা কমতে থাকে এবং তাদের অনেক গুলোই হারিয়ে যায়। বৃদ্ধ যাতি গৃহীত্বা দণ্ডম- পূর্বে তার দুটো পা-ই যথেষ্ট ছিল আর এখন তৃতীয় একটা কিছুর প্রয়োজন হয় - দণ্ডম, হাঁটার জন্য লাঠি। তদপি ন মুঞ্চতি- না! এখানেই আমাদের শেষ না। বরং বিভিন্ন শাস্ত্র এবং আত্ম-উপলব্ধ আচার্যদের দ্বারা এটাই আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে যে- আশা পিণ্ডম, ভিতরের বাসনা গুলো এখনো কমে যাচ্ছে না। তারা শুধু বাড়ছেই আর বাড়ছেই। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ব্যাপার। আমরা হয়ত ভাবতে পারি, এটা কি করে সম্ভব ? এটা সম্ভব, কারণ এটাই এই জড় জগতের নিয়ম। এটাই বাস্তবতা এবং অনেক মানুষের দ্বারা অভিজ্ঞতালব্ধ যারা তাদের জীবনকে সুখবাদী স্বাধীনতায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভের ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে।

এ ধরনের দর্শন অনুশীলন করে মানুষ হতাশা আর ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করবে না। হিন্দীতে একটি শব্দ আছে, "সঠিয় গয়" অর্থাৎ ৬০ বছর পার হলে এই জড় বাসনা গুলো বিরক্তির সৃষ্টি করে, কারণ সে তখন এই বাসনাগুলো পূরণ করতে পারে না, কাজেই কেউ যদি তাকে কিছু বলে তবে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর রেগে যায়। কেন? কারন তার অতৃপ্ত বাসনা। অতএব, কেউ যদি এই স্ফুলিঙ্গ কমানোর চেষ্টা না করে তাহলে বাসনার এই স্ফুলিঙ্গ তা কোন দিনই আপনা আপনি নিজে থেকে কমে যাবে না। বরং এটি মানুষকে পাগল করে তুলবে তার এই বাসনা গুলো পূরণের জন্য। এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করুন।

আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, শুধুমাত্র বছর অতিক্রান্ত হলে পরিবর্তন সাধিত হবে। কখনো নয়। আমাদের পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করতে হবে, আমাদের অনুশীলন করতে হবে, আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে এবং তা অবশ্যই এখনই শুরু করতে হবে। যে পরিমাণ জাগতিক বাসনা হৃদয়ে রয়েছে সে পরিমাণ প্রচেষ্টার দরকার হৃদয় নির্মল করার জন্য। যদি একটি কক্ষ আবর্জনায় পূর্ণ হয় তবে শুধুমাত্র সময় অতিক্রান্ত হলে তা পরিষ্কার হয় না। আমাদের হৃদয় একটি কক্ষের মত যেটি নোংরা, সকল রকম আবর্জনায় পূর্ণ। আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, কেবল সময়ের পরিবর্তনের সাথে এ সকল ভয়ংকর আবর্জনা, এ সকল আঠালো বস্তু যেগুলো অনর্থরূপে হৃদয়ে রয়েছে সেগুলো থেকে সহজেই মুক্ত হবে। এটি অসম্ভব। একটি কক্ষ বার বার পরিষ্কার করা ব্যতিত, একটি কক্ষ পরিষ্কার করার জন্য মনোনিবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতিত কক্ষটি সুন্দররূপে পরিষ্কার হয় না । সুতরাং, এই রকম কোন মূলনীতি নেই যে, কেবল সময় অতিক্রান্ত হলে হৃদয় নির্মল হবে এবং অনর্থ থেকে মুক্ত হবে । এর জন্য কাউকে প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে এবং তা কিশোর বয়সে শুরু করতে হবে।

চলবে.....

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে
প্রসঙ্গঃ গোত্রপ্রথার সেকাল, একাল এবং সমাজের স্বার্থ

– শ্রী অশ্বিনী কুমার সরকার, পৌরহিত্য, স্মৃতিতীর্থ (প্রথম বিভাগ)

গোত্রপ্রথার গোড়ার কথাঃ

কেবল ধর্মের নাম, সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস প্রশ্নে নয়; হিন্দু সমাজে গোত্রের সংজ্ঞা প্রশ্নেও সেকাল ও একালের মধ্যে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। অথচ ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে কোন বিভ্রান্তি থাকা একেবারেই উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্রমতে, বিবাহ হতে হবে সমবর্ণে এবং অসম গোত্রে। কিন্তু স্মার্ত পন্ডিতরা বংশানুক্রমিক সম্প্রদায়কেই ***'বর্ণ'*** বলে গণ্য করেছেন এবং এখনো অনেকে তাই মনে করে চলেছেন। উল্লেখ্য, বর্ণের সাথে গুণ তথা যোগ্যতার সম্পর্ক; আর গোত্রের সাতে সম্পর্ক ঋষির শাসন কিংবা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। বৈদিকশাস্ত্রে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতে ব্যক্ত হয়েছে, অতি প্রাচীনকালে যখন কোন রাজা ও রাজ্য ছিল না, সমাজ চলতো তখন তপোবনকেন্দ্রিক ঋষির নির্দেশে। ঋষিরা ছিলেন তখন এক একটি গোচারণ ভূমির প্রধান। তাঁদের আদেশ-নির্দেশ মেনেই মানবসকল সুশৃঙ্খলভাবে সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করতেন। তখন লোকসংখ্যা কম ছিল এবং ধর্ম ছিল পূর্ণমাত্রায়। তাই সমাজে কোন অন্যায়-অবিচার কিংবা বৈষম্য ছিল না। যে ঋষির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় যিনি বাস করতেন, তিনি সেই ঋষির নামসংবলিত গোত্রের বাসিন্দা বলে গণ্য হতেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যখন শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে থাকে তখন বিশ্বে প্রতিষ্ঠালাভ করে রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রের পর বর্তমানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ধর্মজগৎ ঋষির নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি। গোত্র না হলেও এক একটি সম্প্রদায় শাসন করছেন এক একজন আচার্য তথা ধর্মতত্ত্ববেত্তা ঋষি। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে ***হরেকৃষ্ণ সম্প্রদায়*** ও ***মহানাম সম্প্রদায়ের*** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং পূর্বের গোত্রই যে বর্তমানে ***'সম্প্রদায়'*** রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। গোত্র প্রশ্নে বৈষ্ণবাচার্য ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজও তাঁর প্রণীত ***'মানবধর্ম'*** গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় দৃষ্টান্ত সহকারে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর অভিমতের ভাষা নিম্নরূপঃ ***"হিন্দু সমাজে প্রত্যেকেরই একটা না একটা গোত্র আছে। সে গোত্রটা হয়েছে এক একজন ঋষির নামানুসারে; যেমন ভরদ্বাজ, আলিম্মন্য, অঙ্গিরস প্রমুখ। গোড়ার কথা আমরা ভুলে গেছি। মনে করুন, আপনার পূর্বপুরুষের একসময় কোন ধর্ম ছিল না। এই ভরদ্বাজ ঋষি এসে তাদের ভেতর মনুষ্যত্ব লাভের, দেবত্ব লাভের একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাই আপনার বংশ উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তাঁর নামটা খাতা-পত্রে লিপিবদ্ধ কিংবা স্মৃতিতে জাগরুক আছে – যা আজও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্মে লাগে।"*** এখানে গোত্রজ সম্পর্কীয়দের সাথে ঋষির রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কিংবা ছিল – এমন কথা তিনি বলেননি। বক্তব্যের মূলকথা – যার নেতৃত্বে, উপদেশে কিংবা শাসনে পরিবারের, সমাজের কিংবা নির্দিষ্ট কোন এলাকার মানুষের ধর্মীয়চেতনা বা মনুষ্যত্ববোধ পরিপুষ্ট হয়েছে অথবা জাগ্রত হয়েছে তাঁর নামেই এক একটি গোত্র সৃষ্টি হয়েছে। গোত্রের উৎপত্তি প্রশ্নে একথাই সত্য। আমরা জানি, একই এলাকার মানুষ একই পরিবেশে বসবাস করে এবং সাধারণ কিছু নিয়ম-কানুন বা রীতিনীতি মেনে চলে। ইংরেজিতে এজন্য তাদের একটি ***কাস্ট*** বা ***কমিউনিটির*** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর বাংলায় 'কমিউনিটি' মানেই তো ***'সম্প্রদায়'***।

বর্তমানকালের গোত্রপ্রথাঃ

বর্তমানকালের গোত্রপ্রথায় ঋষির নিয়ন্ত্রিত বা শাসিত এলাকার জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কিংবা অনুমাননির্ভর রক্ত-সম্পর্কের বিষয়। পন্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত পুরোহিত দর্পণের ১০৪৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, উর্দ্ধ ৭ম পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতি ও তার সন্তানগণ সপিন্ড, এভাবে ৮ম থেকে ১৪শ পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতি সমানোদক এবং এরপর নামস্মৃতি পর্যন্ত জ্ঞাতিকে সাকুল্য বলা হয়। সাকুল্যের পরবর্তী সম্পর্কীয়দের সাথে সম্পর্ক ***'গোত্রজ'***। সুতরাং গোত্রজ সম্পর্কীয়রা জ্ঞাতি বলে গণ্য হলেও তাদের অবস্থান বংশধারার একেবারে সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত – যা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা কেবল দুঃসাধ্য নয়; পুরোপুরি অনুমান সাপেক্ষ ব্যাপার। অনুমান সাপেক্ষ ব্যাপার বলেই সমাজে গোত্র প্রশ্নে মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থাপনের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ সংস্কার সমিতির সাবেক সভাপতি শিবশঙ্কর চক্রবর্তী বলেছেন,

বাজারে এলো

ভারত থেকে আমদানীকৃত

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

বি. জি. ফুডস বাজারে নিয়ে এলো

ভারতের তৈরী অত্যন্ত সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত

নিউট্রিলা ও পুজা

সয়াবিন বড়ি

সয়াবিন থেকে প্রস্তুত ও সুস্বাদু উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ আদর্শ পারিবারিক খাদ্য ০% ফ্যাট, ৪৩% প্রোটিন যাহা ডিম, দুধ, মাংস এর কোনটিতেই নেই

খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউট, সাইন্সল্যাবরেটরী ধানমন্ডি, ঢাকা কর্তৃক পরিক্ষীত

বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে-

বি.জি ফুডস্

দে ভবন, ৮৩, তাঁতি বাজার, ঢাকা- ১১০০

ফোন ঃ ৭৩৯০৭৮৯, মোবাইল ঃ ০১৭২৬-৮৬৬৭৯৯

মেসার্স বিপুল জুয়েলার্স

৪০/৪১, তাঁতী বাজার, খলিল ম্যানশন (নীচতলা), ঢাকা-১১০০

ফোনঃ ৭৩৯৪৭৮৬, মোবাইল : ০১৭১৪-০০৫০৯২

দি বিপুল জুয়েলার্স

৫১, ইংলিশ রোড (তাঁতী বাজার মোড়), ঢাকা-১১০০

ফোনঃ ৭৩৯৪৭৮৬, মোবাইল : ০১৭১২-৮৩০৮২৭

সর্বাধুনিক ডিজাইনের উন্নতমানের নিখুঁত স্বর্ণ ও রূপার অলংকারের জন্য পুরাতন ঢাকায় এক অনন্য প্রতিষ্ঠান

স্বর্ণ অলংকার রেখে টাকা ধার দেওয়া হয়। কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব- ২০০৯

স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন, ইস্কনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

মঞ্চে উপবিষ্ট আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

মঞ্চে উপবিষ্ট মায়াপুর (ভারত) থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

ঢাকার রাজপথে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথের র‍্যালী

ঢাকাস্থ স্বামীবাগে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথ উপলক্ষে বিশ্বশান্তি কল্পে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের একাংশ

ঢাকার রাজপথে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা
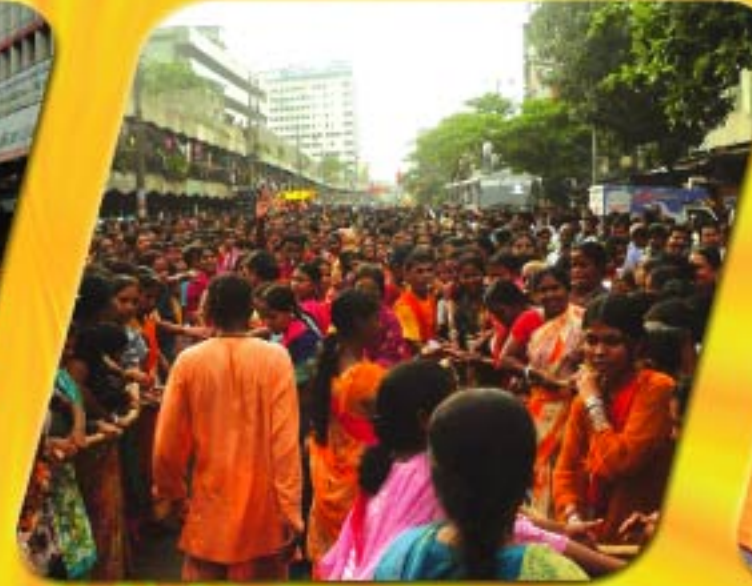
ঢাকার রাজপথে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথের র‍্যালীতে আগত ভক্ত বৃন্দ

ঢাকাস্থ স্বামীবাগে রথযাত্রা উপলক্ষে ৯দিন ব্যাপী প্রসাদ বিতরণের একাংশ

নাটক "রাজা হরিশ চন্দ্র" ভূমিকায় শ্রী শুভনিতাই দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথ উপলক্ষে জাগ্রত ছাত্র সমাজ (ঢাকার) আয়োজনে নাটকে অভিনয়ে ছাত্ররা

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথ উপলক্ষে ভজন পরিবেশন করছেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সুধীর নন্দী

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথ উপলক্ষে ভজন পরিবেশন করছেন বিখ্যাত সঙ্গীত মৌটুসী আচার্য

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

ডাকযোগে গীতা স্টাডি কোর্স

এই কোর্সটির বৈশিষ্ট্য সমূহ

- স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গৃহিনী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই কোর্সে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।
- বাড়ীতে বসেই পড়াশুনা বা দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেও ডাকযোগে এই কোর্সটি করা যায়।
- পাঠ্যক্রমে থাকছে সকলের জন্য অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখা তিন খন্ডের বিশেষ গীতা কোর্স পাঠ্যগ্রন্থ।
- ছয় মাসের এই কোর্সের সমস্ত বইপত্র, ডাক খরচ প্রভৃতি সহ এককালীন ফি মাত্র ৩০০/- টাকা।
- ঢাকায় আনন্দমুখর শিক্ষার্থী সমাবেশে (সম্মেলন) যোগদানের আমন্ত্রণ।
- বছরের যে কোন সময় এই কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়।
- বই দেখে প্রশ্নের উত্তর লিখে (অবশ্যই নিজের ভাষায়) পরীক্ষা দান।
- উত্তীর্ণদের জন্য স্বীকৃতিপত্র (সার্টিফিকেট)।

এই কোর্সটি করে আপনি যা জানতে পারবেন

- এই মহাবিশ্ব কি? তার উৎস ও কারণ কি?
- আমরা কে? কোথা থেকে এসেছি? জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি?
- ভগবান কে? ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?
- প্রকৃতি বা জড়জগত কি? তার নিয়ন্তা কে?
- কেন প্রতিটি মানুষ দুঃখ দুর্দশা এবং উৎকন্ঠায় জর্জরিত?
- কিভাবে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করা যায়?
- কেন মানব সভ্যতায় এত বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ ও সংঘর্ষ?
- ধর্মের মধ্যে এত বিভেদ, বিভিন্নতা কেন?

আপনি যদি কোর্সটি করতে আগ্রহী হন, তাহলে আজই যোগাযোগ করুন

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
শ্রী তরুণশ্যাম দাস ব্রহ্মচারী
ফোন- (অফিস) ০৩৭৯১০০৪৩৭১, মোবাইল: ০১৯১৬৮২৩৬৯৭

সু-খবর! সু-খবর!! সু-খবর!!!

Godhead is light, Nescience is darkness. Where is Godhead there is no nescience.
BACK TO REAL HOME
The Magazine of the Hare Krishna Movement. July-Aug-Sep.-2009 Taka-50
LORD OF THE UNIVERSE

পারমার্থিক নবজাগরণে বাংলাদেশ ইস্‌কন কর্তৃক এই প্রথম সনাতন ধর্মের তত্ত্ব বিজ্ঞান, দর্শন ও শাশ্বত জ্ঞান সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক ইংরেজী পত্রিকা

"ব্যাক টু রিয়েল হোম"

প্রকাশিত হয়েছে। আজই পত্রিকাটির গ্রাহক ও এজেন্ট হোন।

যোগাযোগের ঠিকানা

শ্যাম ভগবান দাস ব্রহ্মচারী
রুম নং-২১
৭৯, স্বামীবাগ, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল- ০১৭-১৫-৭৫৮৯৪৮

"গোত্র হয় পুরুষানুক্রমে; তাই পরস্পরের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকে। তবে গোত্রপ্রধান ঋষিগণ সবাই ব্রাহ্মণ ছিলেন, তা নয়।" (দ্রষ্টব্যঃ জ্ঞানমঞ্জরী, ১ম খন্ড, সংশোধিত ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৫) অন্যদিকে ষোড়শ শতকের স্মার্ত পন্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গোত্র প্রশ্নে বলেছেন, *"গোত্র প্রবর্তক ঋষিরা যেহেতু ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাই ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারও গোত্র নেই। একসময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা নিজেদের গোত্র যজমানদের মধ্যে বিতরণ করায় তারা ওই পুরোহিতের গোত্রপরিচয়ে সমাজে পরিচিতি লাভ করে।"* (দ্রষ্টব্যঃ উদ্বাহতত্ত্বম্/সমাজ দর্পণ, বাণী-অর্চনা সংকলন ১৩৮৯ সন, পৃঃ ১-৫) ব্রাহ্মণদের উচ্চ এবং অন্যদের নীচ করার উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়েছে। অথচ ব্রাহ্মণ, পুরোহিতের সংজ্ঞা কী – এ প্রশ্নে তিনি একবারও কোন কথা বলেননি। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবীণ নেতা ও *'হিন্দুশাস্ত্র'* গ্রন্থের বর্তমান সম্পাদক ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়ও গোষ্ঠীস্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তাঁর হিন্দুশাস্ত্রেও বর্ণ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, গোত্র ইত্যাদির কোন সংজ্ঞা নেই। কিন্তু তিনি তার ওই গ্রন্থে একটি *'বর্ণসঙ্কর তত্ত্ব'* ঠিকই উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বর্ণসঙ্কর তত্ত্ব কি জাতীয় স্বার্থের অনুকূল? বিবাহে *'গোত্র'* গুরুত্বপূর্ণ কিংবা প্রয়োজনীয় বিষয় হলে হিন্দুশাস্ত্রে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই কেন? আসলে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি সমাজের মূল সমস্যা এড়িয়ে চলে, যাতে ব্রাহ্মণ্যবাদ রক্ষা পায়। উল্লেখ্য, উদ্বাহতত্ত্বম্ ও পুরোহিত দর্পণে বর্ণপ্রথার সাথে রক্ত-সম্পর্ক ও গোত্রপ্রথার তালগোল পাকিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তি পোক্ত করা হয়েছে – যা একটি প্রাচীন ও সুসভ্য সমাজকে ধ্বংশের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে ।

সৃষ্টি রহস্য ও রক্তের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু কথাঃ

বৈদিকশাস্ত্র মতে, মানব সৃষ্টির পর গুণ-কর্মানুসারে বর্ণের সৃষ্টি হয় (প্রথমে সমাজ ছিল পরিবার কেন্দ্রিক)। এরপর সমাজে সৃষ্টি হয় গোত্রের (এজন্য সেকালে একই গোত্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বাস ছিল)। গোত্র সৃষ্টির পর পৃথিবীতে রাজ্য/রাষ্ট্র, সম্প্রদায়, জাতি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। বস্তুত *'জাতি'* শব্দের উৎপত্তি জন্ ধাতু থেকে। জাতির সাথে তাই জন্ম তথা সৃষ্টির একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মনু হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসজাত পুত্র এবং মানুষ তথা মানবজাতির আদিপুরুষ। মহাপুরাণ ভাগবত বলছে, মানবজাতির উদ্ভব ঘটে দু'টি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায় হচ্ছে অযৌন পর্যায়; আর দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে যৌন পর্যায়। যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে মানবজাতির সৃষ্টি তথা বিস্তার প্রক্রিয়া মনু থেকেই শুরু হয়। এজন্য ঋষি মনুই হলেন মানুষ তথা মানবজাতির আদিপুরুষ। ধর্ম ও শাস্ত্র মানলে এ তত্ত্ব মানতে হবে। শাস্ত্রমতে ম্যান, মানব, মানবজাতি, মানবতাবাদ, মানবতন্ত্র (গণতন্ত্র) ইত্যাদি শব্দসমূহের উদ্ভব ঘটেছে ব্রহ্মার 'মন্' তথা 'মনু' শব্দ থেকেই। সৃষ্টিসূত্রে তাই বিশ্বের সকল মানুষ ঋষি মনুর সন্তান। জন্ম বা সৃষ্টিসূত্রে তাই বিশ্বের সকল মানুষই একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং ওই জাতির নাম মানবজাতি। সুতরাং বিশ্বের সকল মানুষ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র – সকলেই ঋষি মনুর বংশধর বিধায় মানবপরিবারের প্রত্যেক সদস্যেরই পরস্পরের সাথে রক্তের সম্পর্ক আছে বলে গণ্য করতে হবে। রক্তের সম্পর্কই যদি গোত্রপ্রথার ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়; তবে তো সারা পৃথিবীর মানুষকেই একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে হয়। কিন্তু বৈদিকশাস্ত্রে এভাবে গোত্রপ্রথা প্রতিষ্ঠালাভ করেনি। মহাভারতে উল্লিখিত যে গোত্র প্রথা, তা ঋষির নিয়ন্ত্রিত গোচারণ ভূমি বা এলাকার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে বিবাহ ক্ষেত্রে রক্ত সম্পর্কীয় যে বাধা, তার সীমা জ্ঞাতির নামস্মৃতি তথা সাকুল্য পর্যন্ত থাকাই সমীচীন; এর বেশি নয়। এ ক্ষেত্রে অনুমাননির্ভর, সংশয়পূর্ণ বা প্রমাণহীন কোন রক্তসম্পর্ক টেনে আনা উচিত নয়। মোট কথা, গোত্রের সাথে রক্তের সম্পর্ক থাকার বিষয় প্রাধান্য পাওয়াই উচিত নয়।

বর্তমানে বর্ণের সাথে গুণ-কর্ম তথা যোগ্যতার বিচার নেই। বংশানুক্রমিক সম্প্রদায়কেই বর্তমানে 'বর্ণ' বলে গণ্য করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে *'বিবাহ হতে হবে সমবর্ণে'*। এর ফলে এক সম্প্রদায়ের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের দূরত্ব বাড়ছে এবং সামাজিক ঐক্যের ভিত্ ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এখানে 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকায় প্রকাশিত জওয়াহর খান্নার একটি চিঠির অংশবিশেষ তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি। তিনি ওই চিঠিতে বলেছেন, *"ভারত যদিও একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; তথাপি জনসাধারণের মধ্যে সত্যিকার অর্থে কোন সংহতি গড়ে উঠেনি। সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও হিংসা-বিদ্বেষ আমাদের জাতীয় জীবনের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে। এক জাতের সাথে আরেক জাতের, এক*

সম্প্রদায়ের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের বিয়েতে উৎসাহ যুগিয়ে; আর এ ধরনের দম্পতিকে পুরস্কার প্রদান করে এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করে একটি শুভ সূচনা করা যেতে পারে।" (তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ১৪/০৪/৯৬) জওয়াহর খান্না ঠিক কথাই বলেছেন। তবে এ সংহতি বিনষ্টের মূলে রয়েছে ধর্মতত্ত্বের অপব্যাখ্যা; আর তা হল সম্প্রদায়কে বর্ণ হিসেবে গণ্য করা। বৈদিকশাস্ত্রে বংশানুক্রমিক ***'সম্প্রদায়'*** মোটেই 'বর্ণ' নয়। বর্ণের ভিত্তি গুণ তথা যোগ্যতা। তাই একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বাস। বৈদিকযুগে প্রতিটি গোত্রেও তা ছিল। ঋগ্বেদে তার প্রমাণ রয়েছে। (দ্রষ্টব্যঃ ঋক্ ৯/১১২/অমৃতের সন্ধানে জানুয়ারি-মার্চ'০৯, পৃঃ ৩৭)

অসম গোত্রে বিবাহ ও রক্ত সম্পর্কীয় বাধাঃ

হিন্দু সমাজে (১) সগোত্রীয় ও (২) সপিন্ডজনিত কারণে বিবাহ হয় না। এটা মূলত রক্ত সম্পর্কীয় বাধা। রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে হিন্দু সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ (এ বিধিনিষেধ সাকুল্য সম্পর্ক পর্যন্ত থাকার যুক্তি আছে; যেহেতু রক্ত-সম্পর্ক প্রমাণযোগ্য)। রক্ত-সম্পর্কীয় এ নিষেধাজ্ঞা সেকালে ছিল এবং একালেও আছে। এ নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখতে হবে। কিন্তু বর্তমানে সগোত্রীয় কারণে যে বাধা তার সাথে কি রক্তের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়? না, যায় না। সংশয়পূর্ণ কিংবা অনুমাননির্ভর রক্তসম্পর্কের কথা বললে হবে? সমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তো অনুমাননির্ভর কথা বলা ঠিক নয়। তা'হলে সমগোত্রে বিবাহ-বাধা সেকালে কেন ছিল? সেটা কি অযৌক্তিক ছিল? না, সেটাও যৌক্তিকই ছিল; তবে তার কারণ ছিল ভিন্ন। সেটা ছিল এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের সম্প্রীতি, সহমর্মিতা বৃদ্ধি কিংবা আত্মিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে। আসলে সম্পর্কটা যত দূরের মানুষের মধ্যে স্থাপিত হয়, ঘনিষ্ঠতার শক্তি তত প্রবল হয় (যেমন বিপরীতধর্মী চার্জ বা মের" পরস্পরকে আকর্ষণ করে; আর সমধর্মী চার্জ করে বিকর্ষণ – এমন)। অন্যদিকে বিদ্যমান বংশানুক্রমিক সম্প্রদায়কে কেউ কেউ ***'বর্ণ'*** বলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন – যা ভুল, বিভ্রান্তিকর ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। যারা বর্ণকে সম্প্রদায় বলেন, তারা বলেন গোষ্ঠীস্বার্থ বহাল রাখার জন্য। ধর্মীয় ব্যাপারে অবশ্যই সমাজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমার মতে, এ সম্প্রদায়কেও গোত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে (জ্ঞাতি হলেও যাদের নাম-পরিচয় স্মৃতিতে নেই কিংবা জানা যায় না, তারা আসলে সম্প্রদায়ের মধ্যেই গণ্য হয়) এবং তা গণ্য করলে আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহের ক্ষেত্রে যে বাধা তা দূর হবে (বৈদিকমতে বিবাহ হয় অসম গোত্রে এবং সমবর্ণে)। ফলে হিন্দু সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে এবং এভাবে সমাজের ঐক্যের ভিত্ মজবুত হবে – যা জাতীয় স্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূল। পূর্বোল্লিখিত জওয়াহর খান্নার চিঠিতেও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় একথা বলা হয়েছে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা না হলেও ভারত সরকার তার প্রস্তাব বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে। আন্তঃসাম্প্রদায়িক (তথাকথিত অসবর্ণ) বিয়ে উৎসাহিত করার জন্য ওই দম্পতিকে ৫০ হাজার রুপি অনুদান হিসেবে প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সামাজিক বিচারমন্ত্রী মীরা কুমার বলেছেন, ***"এই ৫০ হাজার রুপি অনুদানের অর্ধেক দেবে কেন্দ্রীয় সরকার; আর বাকিটা দেবে স্ব স্ব রাজ্য সরকার।"*** (দ্রষ্টব্যঃ প্রথম আলো ১৬/০৯/০৬) এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের পিছিয়ে থাকার যুক্তি কী? ধর্মতত্ত্বের কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই তো জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হওয়া উচিত নয়।

ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ – আর যাই হোক, সমাজের ঐক্য ও স্বার্থবিরোধী হতে পারে না। বৈদিকযুগে তা ছিল না (দ্রষ্টব্যঃ প্রভুপাদ প্রণীত গ্রন্থ ***'বৈদিক সাম্যবাদ'***)। ইস্কন সুব্যাখ্যার মাধ্যমে বৈদিকযুগের সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই নিরন্তর কাজ করে চলেছে। হরেকৃষ্ণ।।

****

চলবে...

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি (জন্মাষ্টমী) ২০০৯ উপলক্ষে ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানের সকল এজেন্ট, গ্রাহক, পাঠক ও শুভাকাঙ্খী সহ সকল ভক্তবৃন্দকে শুভেচ্ছা।

–সম্পাদক

যত নগরাদী গ্রাম

মালয়েশিয়ার ক্লাঙ্গ শহরে রথযাত্রা উৎসব

মালয়েশিয়ায় প্রতি বৎসব বিভিন্ন সময়ে অন্তত বিশটি জায়গায় রথযাত্রা অনুষ্ঠান পালন করেন ইসকন ভক্তগণ। এই রথযাত্রাগুলির মধ্যে ক্লাঙ্গ শহরের রথযাত্রায় সর্বাধিক ভীড় পরিলক্ষিত হয়। শ্রীশ্রী জগন্নাথের রথযাত্রাকে ঘিরে এখানকার মানুষদের উৎসাহ অনেক বেশী শুধু ভীড় করাই নয়, রথযাত্রার শোভা যাত্রা সময় তাঁরা শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে অনেক উপহারও নিবেদন করেন। প্রকৃত পক্ষে খরচ ক্লাঙ্গের ভক্ত জনসাধারণই বহন করেন। সম্প্রতি ক্লাঙ্গ শহরে এই বাৎসরিক রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। ইসকন আচার্য ও সন্ন্যাসীবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ ভানু স্বামী মহারাজ, শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী মহারাজ ও শ্রীমৎ ভক্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বামী মহারাজ ও শ্রীমৎ প্রভাবিষ্ণু স্বামী মহারাজ। তিনটি রথ শোভাযাত্রায় ছিল। প্রথম রথটি ছিল শ্রীল প্রভুপাদের রথ। দ্বিতীয় রথে বিরাজ করছিলেন শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবী। তৃতীয় রথে ছিলেন শ্রীশ্রী রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ। ২০ নম্বর লোরঙ্গ বেসি ঠিকানায় ইস্‌কন ক্লাঙ্গ মন্দির থেকে বিকেল পাঁচটায় এই রথযাত্রা শুরু হয়। নারকেল ফাটিয়ে ও রথের সম্মুখের রাস্তা ঝাঁড় দিয়ে রথযাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ ভানু স্বামী মহারাজ। ভক্তগণের মহামন্ত্র সংকীর্তন ও জয় জগন্নাথ ধ্বনির উচ্ছাস ও আনন্দ নৃত্য সহযোগে ক্লাঙ্গ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রাত আটটায় মন্দিরে ফিরে আসে। এরপর সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ ভানু স্বামী মহারাজ ও শ্রীমৎ প্রভাবিষ্ণু স্বামী মহারাজ হরিকথা পরিবেশন করেন।

FICCI মহিলা সংগঠন ইস্‌কন ফুড রিলিফ ফাউন্ডেশন

ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির ফেডারেশনে অব ইনার হুইল ক্লাব ও দিব্য ছায়া ট্রাস্ট্রের মহিলা সংগঠন ফুড রিলিফ ফাউন্ডেশনকে সংবর্ধিত করল। ৫০ এর অধিক মহিলা সংগঠনটিকে ISO ৯০০-২০০০ সনদ তুলে দেয়। বর্তমানে দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এই রন্ধন শালা দুপুরের খাবার সরবরাহ করে চলেছে। কিছু দিনের মধ্যে দুই লক্ষে পৌঁছাবে। স্বয়ংক্রিয় পুরি বানানোর যন্ত্র, ১ টনের অধিক ভাত ও ডাল রান্নার স্টীলের পাত্র সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ৫ তারা মার্কা হোটেলকেও হার মানিয়ে দেয়। ফলে এটি এইচ এ সি সি পি সনদ লাভ করেছে। অতিথিদের দলকে ইসকন স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি মারা গোয়েল এবং ইসকন ফুড রিলিফ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শ্রী পীযুষ গোয়েল স্বাগত জানান। তাদেরকে ইসকনের সমাজ কল্যাণ মূলক কার্যক্রমের পরিধি পরিদর্শনে নিয়ে গেলেন তাঁরা আধুনিক স্বয়ংক্রিয় সামগ্রী, পরিজন পরীক্ষা, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনা দেখে অভিভূত হয়ে যান। সামাজিক কল্যাণ সাধনে তারা ইসকন ফাউন্ডেশনের সাথে একান্তভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং ইনার হুইলে গ্রুপ ১৫লক্ষ রুপী ও ২টি পিকআপ ভ্যান প্রদান করেন। এই কার্যক্রমের ফলে দরিদ্র শিশুদের স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকন্তু ইসকনের বিভিন্ন শাখা দিল্লী, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণটিক, মধ্যপ্রদেশে এরূপ ১৪ লক্ষ শিশুকে টিফিন সরবরাহ করে বলে সবাই ইসকনের ভূয়শী প্রশংসা করেন। দিল্লী কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) অধিক ও কারিগরী সহায়তা দিয়ে থাকে।

যত নগরাদী গ্রাম

ঢাকায় শ্রীমৎ ভক্তিচারু মহারাজের দীক্ষানুষ্ঠান

সম্প্রতি ইসকন গুরুবর্গের অন্যতম ও জিবিসি শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ কর্তৃক ঢাকা স্বামীবাগ আশ্রমে দীক্ষা দান অনুষ্ঠান হয়। তদু উপলক্ষে সমস্ত মন্দিরকে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি নিয়ে সু-সজ্জিত করা হয়। দীক্ষার পূর্বে গুরু মহারাজ সবাইকে দীক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে এবং ব্রহ্মসংহিতার প্রতিটি শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রবচন প্রদান করেন। এরপর পৃথক পৃথক ভাবে তিনটি যজ্ঞবেদীতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে আহুতি প্রদান ও মালা দানের মধ্যদিয়ে ১৩৩জন ভক্তকে হরিনাম দীক্ষা এবং ৬জনকে গায়ত্রী দীক্ষা প্রদান করেন। যজ্ঞ পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ। শেষে হরিনামের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি করলেন।

ইকুয়েডরে ফুড ফর লাইফের প্রসাদ বিতরণ

ইকুয়েডরের গুয়াকিল শহরের ভক্তরা সম্প্রতি শহরটির যুব সংশোধন কেন্দ্রে প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শ্রীমান একাত্ম প্রভুর নেতৃত্বে বৈদিক প্রথা অনুসারে অন্ন, ডাল, ভাজি ও পানীয় প্রভৃতি। সংশোধন কেন্দ্রটিতে মূলত চুরি ও মাদক গ্রহণের দায়ে দোষী যুবকদের এনে রাখা হয়। ভক্তরা যখন কেন্দ্রটির পরিচালকের সাথে সাক্ষাত করেন তখন তিনি জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রটিতে নব্বই জনের আহারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া থাকলেও প্রতিদিন গড়ে তা ১২০ জনের মধ্যে বিরতণ করা হত। যার ফলে প্রতিদিন নানা রকম ঝগড়া ফ্যাসাদ করেছিল। সকলেই পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে প্রসাদ আস্বাদন করতে পেরে আনন্দিত হয়েছিল। সংশোধন কেন্দ্রটির পরিচালক নিরাপত্তারক্ষী ও কেন্দ্রের যুবকদের সকলের মুখেই হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। এমনকি তাদের সাথে চলে আসতেও আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কৃষ্ণ প্রসাদ তাদের হৃদয়ে পারমার্থিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

পাকিস্তানে মন্দির সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ

ভারতের ১৯৯২ সালে যখন "বাবরী মসজিদ ধ্বংস" গুজব উঠে ঠিক সে সময় পাকিস্তানে অনেক মন্দির ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারপর থেকে বিভিন্ন সময়ে মন্দিরের সংরক্ষণ বিষয়টি সচেতন সুধী সমাজের মনে রেখাপাত করতে থাকে। সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ সেখানকার ১৬টি মন্দির সংরক্ষণের জন্য জোড়ালো ভাবে জনমত সৃষ্টি করে চলেছে। তন্মধ্যে লাহোরের একমাত্র কৃষ্ণ মন্দির বর্তমানে সাধু সন্তর পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। এখানে নিয়মিত ভক্তরা সমাগত হয়ে বিভিন্ন উৎসব যেমন দীপাবলী পূজাপার্বন ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া নীলা গুম্বাদের টাক্সালীতে মহর্ষি গুরু বাল্মিক স্বামী মন্দির, ভাটি গেটের ভিতরে পারিবারিক মন্দিরও কিছুটা অগ্রগতির পথে রয়েছে।

প্রিন্সটনে "একবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুত্ব" সপ্তাহ

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু লাইফ প্রোগ্রাম ও ছাত্র সংঘে প্রিন্সটন হিন্দু সৎসঙ্গম এর যৌথ উদ্যোগে একবিংশ শতকে হিন্দুত্ব শীর্ষক দশটি ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির মধ্যে ছিল-প্রবচন, আলোচনা ও যোগ অনুশীলন। অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে ভারতীয় পারমার্থিক সংস্কৃতির সাথে আমেরিকান আধুনিক সভ্যতার সেতুবন্দন গড়ে ওঠেছিল। আয়োজকদের আশা এর ফলে, কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয় বরং বৃহত্তর সম্প্রদায় গুলির মধ্যে পারস্পরিক ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠবে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক শ্রীযুক্ত বীনিত চন্দর বলেন এর মাধ্যমে আমরা হিন্দুদের বিশালতা ও ব্যাপকত্বের ধারণাই সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হলো প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্য উপস্থাপন করা হলো। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে-

প্রথম স্কন্ধ : "সৃষ্টি"

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সপ্তম অধ্যায়

শ্লোক-৩১

দৃষ্ট্বাস্ত্রতেজস্তু তয়োস্ত্রীল্লোকান্ প্রদহন্মহৎ।
দহ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সাংবর্তকমমংসত ॥৩১॥

শব্দার্থ

দৃষ্ট্বা-দর্শন; **অস্ত্র**-অস্ত্র; **তেজঃ**-তেজ; **তু**-কিন্তু; **তয়োঃ**-উভয়ের; **ত্রিন্ লোকান্**-ত্রিভুবন; **প্রদহৎ**-দগ্ধ; **মহৎ**-প্রচণ্ডভাবে; **দহ্যমানাঃ**-দগ্ধ; **প্রজাঃ**-প্রজা; **সর্বাঃ**-সর্বত্র; **সাংবর্তকম্**- যে অগ্নি প্রলয়ের সময় ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করে; **অমংসত**-ভাবতে শুরু করল।

অনুবাদ

ত্রিভুবনের সমস্ত অধিবাসীরা সেই অস্ত্র দুটির সংঘর্ষের আগুনের তাপ অনুভব করে প্রলয়কালীন সংবর্তক আগুনের কথা ভাবতে লাগলেন।

তাৎপর্য

তিনটি ভুবন হচ্ছে উচ্চতর স্বর্গলোক, মধ্যবর্তী ভূলোক এবং নিম্নবর্তী পাতাললোক। ব্রহ্মশির অস্ত্র যদিও এই পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই অস্ত্র দুটি সংঘর্ষের ফলে যে তাপ সৃষ্টি হয়েছিল, তা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রসারিত হয়েছিল, এবং বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরা সেই প্রচণ্ড তাপ অনুভব করেছিলেন এবং তার সঙ্গে সংবর্তক আগুনের তুলনা করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে মূর্খ লোকেরা যে বলে অন্যান্য গ্রহে কোন জীব নেই, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

শ্লোক-৩২

প্রজোপদ্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরং চ তম্।
মতং চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জুনো দ্বয়ম্ ॥৩২॥

শব্দার্থ

প্রজা-জনসাধারণ; **উপদ্রবম্**-উপদ্রব; **আলক্ষ্য**-দর্শন করে; **লোক**-গ্রহসকল; **ব্যতিকরম্**-ধ্বংস; **চ**-ও; **তম্**-তা; **মতম্**-মত; **চ**-এবং; **বাসুদেবস্য**-বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের; **সংজহার**-সংবরণ; **অর্জুনঃ**-অর্জুন; **দ্বয়ম্**-উভয় অস্ত্র।

অনুবাদ

এইভাবে জনসাধারণকে উপদ্রুত দেখে এবং গ্রহসমূহের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস আশঙ্কা করে অর্জুন তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রকেই তৎক্ষণাৎ সংবরণ করলেন।

তাৎপর্য

আধুনিক আণবিক অস্ত্র যে এই পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে বলে মনে করা হয়, তা একটি শিশুসুলভ কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত, আণবিক অস্ত্রের পৃথিবী ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই এবং দ্বিতীয়ত, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না অথবা ধ্বংস হতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ম যে চরম শক্তিসম্পন্ন সে কথা মনে করাও ভুল। জড়া প্রকৃতির নিয়ম ভগবানের অধ্যক্ষতায় কার্যকরী হয়, যে কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে, তাঁর অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি পরিচালিত হয়। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল এই পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে, রাজনীতিবিদদের খামখেয়ালীর দ্বারা নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন চাইলেন যে দ্রোণী এবং অর্জুন উভয়ের অস্ত্র দুটিই সংবরণ করা হোক, তখন অর্জুন তৎক্ষণাৎ তা সম্পাদন করেছিলেন। তেমনই, সর্বশক্তিমান ভগবানের প্রতিনিধি রয়েছেন, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই কেবল কার্য সম্পাদিত হয়।

শ্লোক-৩৩

তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতম্।
ববন্ধামর্ষতাম্রাক্ষঃ পশুং রশনয়া যথা।।৩৩।।

শব্দার্থ

ততঃ-তখন; **আসাদ্য**-গ্রেপ্তার করে; **তরসা**-দক্ষতা সহকারে; **দারুণম্**-ভয়ঙ্কর; **গৌতমী-সুতম্**-গৌতমীর পুত্র; **ববন্ধ**-বন্ধন করে; **অমর্ষ**-ক্রুদ্ধ; **তাম্র-অক্ষঃ**-তাম্রের মতো রক্তিম চক্ষুদ্বয়; **পশুম্**-পশু; **রশনয়া**-রজ্জুর দ্বারা; **যথা**-যেমন।

অনুবাদ

অর্জুন, ক্রোধে যাঁর চোখ দুটি তাম্র-গোলকের মতো

রক্তিম হয়ে উঠেছিল, ক্ষিপ্রভাবে গৌতমীর পুত্রকে গ্রেপ্তার করে একটি পশুর মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন।

তাৎপর্য

অশ্বত্থামার মাতা কৃপী ছিলেন গৌতম কুলোদ্ভূতা। এই শ্লোকের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে অশ্বত্থামাকে একটি পশুর মতো দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল; শ্রীধর স্বামীর মতে, অর্জুন তাঁর ধর্ম অনুসারে এই ব্রাহ্মণ-পুত্রটিকে একটি পশুর মতো রজ্জুবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্রীধর স্বামীর এই মন্তব্যটি শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী উক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। অশ্বত্থামা যদিও ছিল দ্রোণাচার্য এবং কৃপীর পুত্র কিন্তু অধঃপতিত হওয়ার ফলে তার সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহার না করে পশুর মতো আচরণ করা উপযুক্তই হয়েছে।

শ্লোক-৩৪

শিবিরায় নিনীষন্তং রজ্জ্বা বদ্ধ্বা রিপুং বলাৎ।
প্রাহার্জুনং প্রকুপিতো ভগবানম্বুজেক্ষণঃ।।৩৪।।

শব্দার্থ

শিবিরায়-শিবিরে যাওয়ার পথে; **নিনীষন্তম্**-তাকে নিয়ে যাওয়ার সময়; **রজ্জ্বা**-রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধ্বা**-বদ্ধ; **রিপুম্**-শত্রু; **বলাৎ**-বলপূর্বক; **প্রাহ**-বলেছিলেন; **অর্জুনম্**-অর্জুনকে; **প্রকুপিতঃ**-ক্রুদ্ধ; **ভগবান্**-পরমেশ্বর ভগবান; **অম্বুজ-ঈক্ষণঃ**-পদ্মের মতো সুন্দর যাঁর দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করার পর অর্জুন তাকে শিবিরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে ক্রুদ্ধ অর্জুনকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে অর্জুন এবং কৃষ্ণ উভয়কেই ক্রুদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অর্জুনের চক্ষুদ্বয় ক্রোধে তাম্রের মতো আরক্তিম হলেও শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় পদ্মের মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে অর্জুনের ক্রোধ এবং শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ সমপর্যায় নয়। ভগবান অপ্রাকৃত, এবং তাই তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরম ভাব সমন্বিত। তাঁর ক্রোধ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবের ক্রোধের মতো নয়। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম-তত্ত্ব, তাই তাঁর ক্রোধ এবং আনন্দ উভয়ই সমান। তাঁর ক্রোধ জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশিত হয় না। এটি কেবল তাঁর ভক্তের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রকাশ, কেন না সেটিই হচ্ছে তাঁর অপ্রাকৃত প্রকৃতি। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হলেও তাঁর ক্রোধের পাত্র তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হন। তিনি সর্ব অবস্থাতেই অপরিবর্তনীয়।

শ্লোক-৩৫

মৈনং পার্থার্হসি ত্রাতুং ব্রহ্মবন্ধুমিমং জহি।
যোঽসাবনাগসঃ সুপ্তানবধীন্নিশি বালকান্ ।।৩৫।।

শব্দার্থ

মা-না; **এনম্**-তাকে; **পার্থ**-হে অর্জুন; **অর্হসি**-উচিত; **ত্রাতুম্**-ত্রাণ করা; **ব্রহ্ম-বন্ধুম্**-ব্রাহ্মণের আত্মীয়; **ইমম্**-তাকে; **জহি**-হত্যা করা; **যঃ**-যার আছে; **অসৌ**-সেই সমস্ত; **অনাগসঃ**-নিষ্পাপ; **সুপ্তান্**-সুপ্ত অবস্থায়; **অবধীৎ**-হত্যা করেছিল; **নিশি**-রাত্রিবেলা; **বালাকান্**-বালকদের।

অনুবাদ

হে পার্থ, যে অশ্বত্থামা নিরপরাধ, নিদ্রিত শিশুদের রাত্রিবেলা হত্যা করেছে, এই সেই ব্রাহ্মণাধমকে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, একে বধ কর।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মবন্ধু কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকে তা হলে তাকে ব্রাহ্মণ বলা চলে না, তাকে বলা হয় ব্রহ্মবন্ধু। হাইকোর্টের বিচারপতির পুত্র যেমন বিচারপতি নয়, তবে তাকে বিচারপতির পুত্র বা বিচারপতির আত্মীয় বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। তেমনি, জন্ম অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হয়। হাইকোর্টের বিচারপতির পদ যেমন উপযুক্ত যোগ্যতা অনুসারে লাভ করা যায়, তেমনই ব্রাহ্মণত্ব উপযুক্ত গুণাবলীর দ্বারাই কেবল লাভ করা যায়। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত মানুষের মধ্যে যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী প্রকাশ হতে দেখা যায়, তা হলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে, এবং ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত কোনও মানুষের মধ্যে যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না দেখা যায়, তা হলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না, বড় জোর তাকে ব্রাহ্মণের আত্মীয় বা ব্রহ্মবন্ধু বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সমস্ত ধর্মের অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বেদে সে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, এবং তার কারণ তিনি পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক-৩৬

মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ম্।
প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্মবিৎ।।৩৬।।

শব্দার্থ

মত্তম্-মত্ত; **প্রমত্তম্**-প্রমত্ত; **উন্মত্তম্**-উন্মত্ত; **সুপ্তম্**-নিদ্রিত; **বালম্**-বালক; **স্ত্রিয়ম্**-স্ত্রীলোক; **জড়ম্**-মূর্খ; **প্রপন্নম্**-শরণাগত; **বিরথম্**-রথবিহীন; **ভীতম্**-ভীত; **ন**-না; **রিপুম্**-শত্রু; **হন্তি**-হত্যা করা; **ধর্ম-বিৎ**-ধর্মজ্ঞ।

অনুবাদ

মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, নিদ্রিত, নিশ্চেষ্ট, শরণাগত, ভগ্নরথ, ভয়ার্ত, বালক বা স্ত্রীলোক শত্রু হলেও ধার্মিক ব্যক্তি তাকে বধ করেন না।

তাৎপর্য

যে শত্রু বাধা দান করে না তাকে ধর্মের বীর কখনও হত্যা করেন না; পূর্বে যুদ্ধ হত ধর্ম অনুশাসনের ভিত্তিতে; ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কখনও তা হত না। শত্রু যদি পানোন্মত্ত, নিদ্রিত ইত্যাদি উপরোক্ত অবস্থায় থাকত, তা হলে কখনও তাকে হত্যা করা হত না। এগুলি হচ্ছে ধর্মযুদ্ধের কয়েকটি নীতি। পূর্বে কখনও স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতাদের খেয়ালের ফলে যুদ্ধ হত না; তা অনুষ্ঠিত হত সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত ধর্মনীতি অনুসারে। ধর্মনীতির ভিত্তিতে হিংসা আচরণ করা তথাকথিত অহিংসা থেকে অনেক উন্নত।

শ্লোক-৩৭

স্বপ্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃ খলঃ।
তদ্বধস্তস্য হি শ্রেয়ো যদ্দোষাদ্যাত্যধ পুমান্ ॥৩৭॥

শব্দার্থ

স্ব-প্রাণান্—নিজের জীবন; **যঃ**—যে; **পরপ্রাণৈঃ**—অনেক হত্যা করে; **প্রপুষ্ণাতি**—যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়; **অঘৃণঃ**—নির্লজ্জ; **খলঃ**—ক্রূর; **তৎ-বধঃ**—তাকে হত্যা করা; **তস্য**—তার; **হি**—অবশ্যই; **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয়; **যৎ**-যার দ্বারা; **দোষাৎ**-দোষের দ্বারা; **যাতি**—গমন করে; **অধঃ**-নিম্নতর লোকে; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

যে ঘৃণ্য ক্রূর ব্যক্তি পরের প্রাণ বধ করে স্বীয় প্রাণ পরিপোষণ করে, তাকে বধ করাই তার পক্ষে মঙ্গলজনক, তা না হলে তার সেই পাপের ফলে সে নরকগামী হবে।

তাৎপর্য

যে মানুষ অপরকে হত্যা করে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জভাবে জীবনধারণ করে, তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়াই উপযুক্ত শাস্তি। রাজ্য-শাসনের নীতি হচ্ছে নিষ্ঠুর হত্যাকারীকে নরক থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া। সরকার যে হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দান করে তার পক্ষে তা মঙ্গলজনক, কেন না তা না হলে তার পরবর্তী জীবন তার সেই পাপের ফল তাকে ভোগ করতে হবে। হত্যাকারীকে এইভাবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যদিও সব চাইতে কঠোর দণ্ড, তবুও সেটা তার মঙ্গলেরই জন্য। স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, রাজা যখন হত্যাকারীকে এই দণ্ড দান করেন, তার ফলে সে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। এমন কি তার ফলে সে স্বর্গলোকেও উন্নীত হতে পারে। ধর্মনীতি এবং সমাজনীতির প্রণেতা মনু নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, পশুঘাতকদেরও হত্যাকারী বলে বিবেচনা করতে হবে, কেন না পশুর মাংস উন্নত মানুষদের আহার্য নয়। মানুষের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। তিনি বলেছেন যে পশুহত্যা সংঘবদ্ধভাবে চক্রান্ত করে মানুষ হত্যা করারই মতো, এবং তার ফলে তাদের সকলকে দণ্ডভোগ করতে হবে। পশুহত্যায় যে অনুমতি দেয়, যে পশুকে হত্যা করে, যে পশু-মাংস বিক্রয় করে, যে পশু-মাংস পরিবেশন করে, তারা সকলেই হচ্ছে ঘাতক এবং প্রকৃতির নিয়মে তাদের সকলকেই দণ্ডভোগ করতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সত্ত্বেও কেউই আজ পর্যন্ত একটি জীবও তৈরি করতে পারেনি, এবং তাই কোন প্রাণীকে হত্যা করার অধিকার কারও নেই। যারা মাংসাহারী তাদের জন্য যজ্ঞে পশুবলি দিয়ে কেবল সেই মাংস আহার করার অনুমতি শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, এবং এই ধরনের অনুমোদন পশুহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে কসাইখানায় ইচ্ছামত পশুবলি দেওয়া বন্ধ করার জন্য। যজ্ঞবেদিতে পশুবলি দেওয়া হলে সেই পশু সরাসরিভাবে মনুষ্য স্তরে উন্নীত হয়, এবং পশু-মাংস আহারীও তার পাপ থেকে মুক্ত হয়। জড় জগৎ সর্বদাই নানা রকম উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, এবং পশুহত্যার ফলে সেই পরিবেশ অত্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং নানা রকমের প্রাকৃতিক গোলযোগ দেখা দেবে।

শ্লোক-৩৮

প্রতিশ্রুতং চ ভবতা পাঞ্চাল্যৈ শৃণ্বতো মম।
আহরিষ্যে শিরস্তস্য যস্তে মানিনি পুত্রহা ॥৩৮॥

শব্দার্থ

প্রতিশ্রুতম্—প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে; **চ**—এবং; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **পাঞ্চাল্যৈঃ**—পাঞ্চালের রাজকন্যা (দ্রৌপদী); **শৃণ্বতঃ**— যা শোনা হয়েছে; **মম**—ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারা; **আহরিষ্যে**—আমাকে আহরণ করতে হবে; **শিরঃ**—মস্তক; **তস্য**—তার; **যঃ**—যার; **তে**—তোমার; **মানিনি**—বিবেচনা; **পুত্র-হা**—পুত্রদের হত্যাকারী।

অনুবাদ

হে অর্জুন, আমি শুনেছি যে তুমি দ্রৌপদীর কাছে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছ যে তুমি তাঁর পুত্রহত্যাকারীর মস্তক তাঁকে উপহার দেবে।

শ্লোক-৩৯

তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা।
ভর্তুশ্চ বিপ্রিয়ং বীর কৃতবান্ কুলপাংসনঃ ॥৩৯॥

শব্দার্থ

তৎ–তার ফলে; **অসৌ**–এই; **বধ্যতাম্**–হত্যা করা হবে; **পাপঃ**–পাপী; **আততায়ী**–আততায়ী; **আত্ম**–নিজের; **বন্ধু-হা**–স্বজন হত্যাকারী; **ভর্তুঃ**–পতি; **চ**–ও; **বিপ্রিয়ম্**–অপ্রিয়; **বীর**–হে বীর; **কৃতবান্**–করেছে; **কুল-পাংসনঃ**–কুলাঙ্গার।

অনুবাদ

অতএব হে বীর! এই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার তোমার স্বজনদের হত্যা করেছে, এবং স্বীয় প্রভু দুর্যোধনের অনভিপ্রেত কার্য অনুষ্ঠান করেছে। সুতরাং এই অশ্বত্থামাকে বধ কর।

তাৎপর্য

এখানে দ্রোণাচার্যের পুত্রকে কুলাঙ্গার বলে নিন্দা করা হয়েছে। দ্রোণাচার্য ছিলেন শ্রদ্ধার্হ। যদিও তিনি শত্রুপক্ষে যোগদান করেছিলেন, তবুও পাণ্ডবেরা তাঁকে সর্বদাই গভীর দৃষ্টিতে দেখতেন, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হওয়ার পূর্বে অর্জুন প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁদের সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু দ্রোণাচার্যের পুত্র এমন সমস্ত জঘন্য কর্ম করেছিল, যা উচ্চ কুলোদ্ভূত কোন দ্বিজ কখনও করেনি। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করেছিল। তার এই জঘন্য কর্ম তার প্রভু দুর্যোধনও অনুমোদন করেনি, এবং এই রকম নৃশংসভাবে পাণ্ডবদের নিদ্রিত পুত্রদের হত্যা করার জন্য দুর্যোধন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অর্জুনের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার ফলে অশ্বত্থামাকে দণ্ডদান করা অর্জুনের কর্তব্য ছিল। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে অতর্কিতে আক্রমণ করে অথবা পিছন থেকে আক্রমণ করে প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় অথবা গৃহে আগুন লাগায় অথবা স্ত্রী অপহরণকারী, তাকে হত্যা করাই হচ্ছে বিধেয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সে কথা মনে করিয়ে দেন যাতে অর্জুন যথাযথভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন।

শ্লোক-৪০

সূত উবাচ

এবং পরীক্ষতা ধর্মং পার্থঃ কৃষ্ণেন চোদিতঃ।
নৈচ্ছদ্ধন্তুং গুরুসুতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্ ॥৪০॥

শব্দার্থ

সূতঃ উবাচ– সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**–এইভাবে; **পরীক্ষতা**–পরীক্ষিত হয়ে; **ধর্মম্**–কর্তব্যকর্ম সম্পাদন সম্বন্ধে; **পার্থঃ**–শ্রীঅর্জুন; **কৃষ্ণেন**–শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **চোদিতঃ**–অনুপ্রাণিত হয়ে; **ন ঐচ্ছৎ**–করতে চাইলেন না; **হন্তুম্**–হত্যা করতে; **গুরু-সুতম্**–গুরুপুত্র; **যদ্যপি**–যদিও; **আত্ম-হনম্**–পুত্রদের হত্যাকারী; **মহান্**–মহান।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেনঃ এইভাবে অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁকে উত্তেজিত করছিলেন, তবুও মহাত্মা অর্জুন তাঁর মহত্ত্ব হেতু পুত্রহন্তা হলেও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে হত্যা করতে চাইলেন না।

তাৎপর্য

অর্জুন ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন মহাত্মা, যা এখানে পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে। এখানে ভগবান স্বয়ং তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন দ্রোণাচার্যের পুত্রকে হত্যা করার জন্য, কিন্তু বিবেচনা করেছিলেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র যদিও ছিল কুলাঙ্গার এবং যদিও সে অনর্থক নানা রকম নৃশংস কর্ম করেছিল, কিন্তু তবুও তাঁর গুরুদেবের পুত্র বলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্য বাহ্যিকভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করছিলেন। এমন নয় যে ধর্ম সম্বন্ধে অর্জুনের যথার্থ জ্ঞান ছিল না, অথবা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের পরীক্ষা করেন লোকসমক্ষে তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করার জন্য গোপিকাদের তিনি এইভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, প্রহ্লাদ মহারাজকে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন। সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরাই ভগবানের এই পরীক্ষায় সাফল্য সহকারে উত্তীর্ণ হন।

শ্লোক-৪১

অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ।
ন্যবেদয়ত্তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যা আত্মজান্ হতান্ ॥৪১॥

শব্দার্থ

অথ– তারপর; **উপেত্য**–উপস্থিত হয়ে; **স্ব**–স্বীয়; **শিবিরম্**–শিবিরে; **গোবিন্দ**–গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ); **প্রিয়**–প্রিয়; **সারথি**–সারথি; **ন্যবেদয়ৎ**–সমর্পণ করে; **তম্**–তাঁকে; **প্রিয়ায়ৈ**–তাঁর প্রিয়া দ্রৌপদীকে; **শোচন্ত্যা**–শোকমগ্না; **আত্ম-জান**–পুত্রদের; **হতান্**–হত্যা করেছে।

অনুবাদ

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সখা ও সারথিরূপে বরণ করেছিলেন, সেই অর্জুন নিজ শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিহত পুত্রশোকমগ্না পত্নী দ্রৌপদীর কাছে অশ্বত্থামাকে সমর্পণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের অপ্রাকৃত সম্পর্ক ছিল পরম বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে তাঁর প্রিয়তম সখারূপে সম্বোধন করেছেন। এইভাবে প্রতিটি জীবই ভৃত্যরূপে অথবা সখারূপে অথবা পিতা-মাতারূপে অথবা প্রেমিকরূপে ভগবানের সঙ্গে এক অপ্রাকৃত প্রেমের সম্পর্কে সম্পর্কিত। এইভাবে সকলেই চিন্ময় ভগবদ্ধামে ভগবানের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতে পারেন, যদি তিনি সেই বাসনা করেন এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিযোগের মাধ্যমে সেই চেষ্টা করেন।

চলবে...

ছবিতে ছোটদের দশ অবতার

তারা ব্রহ্মকে প্রণাম নিবেদন করলেন

এবং বললেন- পিতা, কেমন করে আপনার সেবার মাধ্যমে এই জগতে ও পরজগতে আমাদের সুখশান্তি নিশ্চিত করতে পারি।

হৃদয়কে সম্পূর্ণ হিংসা মুক্ত রাখবে, অনেক ধার্মিক সন্তানের জন্ম দিবে, পৃথিবীতে নিয়মনীতি প্রদান করবে এবং তুমি হবে এই জগতের মানুষের নিয়ম নীতির প্রণেতা।

তারপর স্বয়ম্ভূমনু এবং শতরূপা সম্মুখে উপস্থিত হলেন-
আমি কি করব?,
ও! ভগবান বিষ্ণু আপনি দয়া করে
আমাকে সাহায্যে করুন পৃথিবীকে
উপরে তুলে আনতে......

যখন ব্রহ্মা ভগবানের ধ্যান করছিলেন- হঠাৎ দেখলেন তাঁর নাসিকা থেকে কিছু একটা নির্গত হচ্ছে এবং একটি ছোট শুকর আস্তে আস্তে বিশাল প্রকান্ড ধারন করছে-
এটা কি ধরনের একটা বৃহৎ আকারে পশু! এবং নাসিকা থেকে কি হচ্ছে!

এমন কি ব্রহ্মা যখন ইহা সমন্ধে ভাবছে তখন তিনি বিস্ময়াভূত হচ্ছেন

এবং বর্ধিত হচ্ছে

বলতে গেলে ইহা একটি মস্তবড় হাতির মত ব্রহ্মা ইহা দেখে আচার্য হচ্ছিলেন
তিনি ভাবলেন একি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু নিজেই?

যখন ব্রহ্মা এরকম চিন্তা করছিলেন তখন শুকরটি আস্তে আস্তে
একটি মস্ত বড় পাহাড়ের মত রূপ ধারণ করছিলেন
এবং হুংকার দিচ্ছে.......

ইহা নিশ্চিত ভগবান
বিষ্ণু ছাড়া আর অন্য
কেউ নয়!

তারপর আরেকটি ভয়ংকর হুংকার নির্গত হল।
দেখা গেল একটি মস্তবড় ঠোঁট যেন বাতাসে
ভাসছে.......

ইহার খুর দ্বারা মেঘকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে...

সমুদ্রকে বিভক্ত করছে
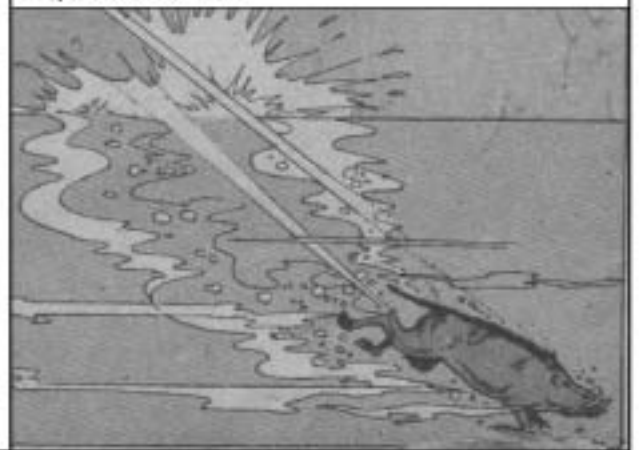
এবং নাক দিয়ে যেন সমুদ্র গর্ভে পৃথিবীকে খুঁজছে
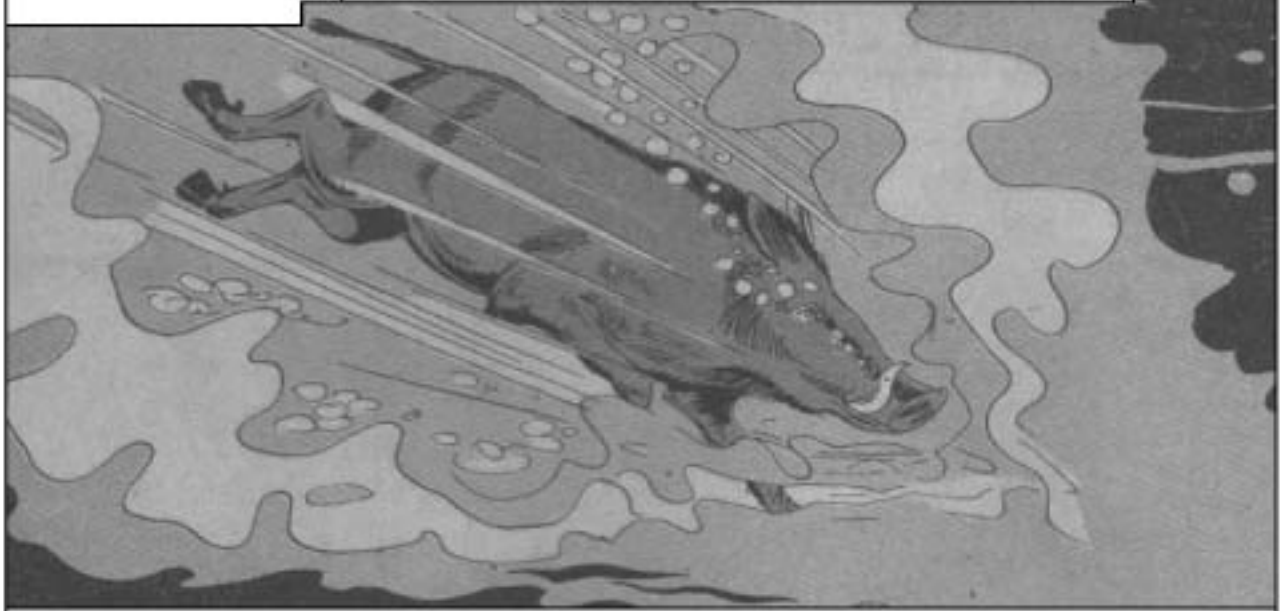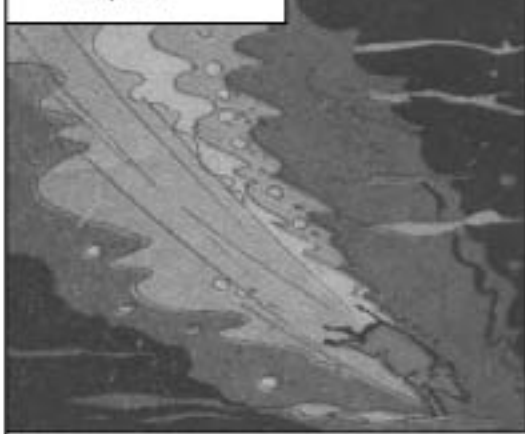
● অনুবাদক: শ্রী সুন্দর নিত্যানন্দ দাস

● চলবে......

আদর্শ গৃহস্থ জীবন

ভণ্ডামি নিষ্প্রয়োজন

নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই আধ্যাত্মিক প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তবে ভোগের বাসনা নিয়ে নারীকে দর্শন করাই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, বিষয় ভোগের প্রতি আসক্তি পারমার্থিক প্রগতির পক্ষে আদৌ উপযোগী নয়। তবে বর্তমান সময়ে, বিশেষত: নারী- পুরুষ অবাধে মেলামেশা করছে এবং এর ফলস্বরূপ কখনও কখনও স্বভাবতই মন উত্তেজিত হয়। সুতরাং আমাদের কিছু পূর্ব সতর্কতা নিতে হবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ব সতর্কতা হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হওয়া।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, কাঠের নির্মিত নারীমূর্তি দর্শন করেও তাঁর মন উত্তেজিত হয়। অবশ্য মহাপ্রভু এই কথার মাধ্যমে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যেখানে কাঠের নারীমূর্তি উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে, সেক্ষেত্রে প্রকৃত নারী দর্শন করা কতই না মোহজনক, বিশেষতঃ এই যুগে আমাদের মতো অধঃপতিত মানুষদের পক্ষে। নারী দর্শনে এই উত্তেজনা খুবই স্বাভাবিক। তবে কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত আস্বাদ লাভ করার মাধ্যমে, কৃষ্ণভাবনায় প্রগতি সাধনের মাধ্যমে এই উত্তেজনাকে রোধ করা যায়।

কিন্তু তাকে রোধ করা যদি একেবারেই কঠিন হয় পড়ে, তা হলে গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করতে হবে। এইভাবে যৌন-উত্তেজনা প্রশমিত হবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন সম্ভব হবে।

কেউ যদি যৌনজীবনকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেন এবং তাঁর আসক্তিকে কৃষ্ণমুখী করে তুলতে সক্ষম হন, তা হলে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু যিনি সেই স্তরে উন্নীত হতে আপাতত অক্ষম, তাঁর পক্ষে কৃত্রিমভাবে ত্যাগের অভিনয় তথা ভণ্ডামি করার কোনা প্রয়োজন নেই। বরং গৃহস্থ হয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করাই শ্রেয়।

নিঃস্বার্থ কৃষ্ণসেবাই লক্ষ্য

যৌন কামনাকে দমন করতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এই বিবাহ হচ্ছে এক প্রকার আপোষ মীমাংস এবং ছাড়পত্রবিশেষ। তবে কৃত্রিম ব্রহ্মচর্যের মিথ্যাচারকে বন্ধ করার জন্য এর ব্যাপক প্রয়োজনও রয়েছে। অবশ্য কেউ যদি শুদ্ধভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করতে সক্ষম হয়, তাকে জোর করে গৃহস্থ করা যায় না এবং গৃহস্থ হওয়ার জন্য তাকে উৎসাহিত করাও উচিত নয়।

কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর বয়সে প্রত্যেকেরই উচিত স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবায় মনোনিবেশ করা। গৃহস্থ মানে এই নয় যে, আজীবন স্ত্রী সঙ্গে থাকতে হবে। সাধারণত ২৫ বছর বয়সে বিবাহিত হয়ে বড় জোর ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত– অর্থাৎ মোট ২৫ বছরের পর কঠোরভাবে যৌন জীবন থেকে বিরতি গ্রহণ করতে হবে।

আর ৬৫ থেকে ৭০ বছর বয়সের মধ্যে প্রত্যেককেই কার্যত সন্ন্যাস নিতেই হবে। অর্থাৎ সন্ন্যাস বেশ ধারণ না করলেও কাজের মাধ্যমে তাকে সন্ন্যাসীর মতো অবশ্যই হতে হবে। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে নিঃস্বার্থ কৃষ্ণসেবা করা। সেটিই প্রকৃত সন্ন্যাস। আমরা যদি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণসেবা করতে পারি, তা হলে সর্ব অবস্থাতেই সকলেই সন্ন্যাসী বলে পরিগণিত হবে।

গীতায় বলা হয়েছে যে, যিনি নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণসেবা করছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং যোগী (গীতা ৬/১)। সুতরাং সকল বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষেরই কর্তব্য হল, নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণসেবা প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণ করা।

গৃহে থাক বনে থাক, সদা হরি বলে ডাক

১৯৭৬ সালের ২৯ অক্টোবর, শ্রীপাদ তুষ্টকৃষ্ণ প্রভুর কাছে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত চিঠিটি পাঠিয়েছিলেনঃ

"আমি জানি, তুমি বুদ্ধিমান এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারে খুব সুন্দরভাবে সাহায্য করতে পার। যদি তুমি মনে কর, মায়া তোমাকে আকর্ষণ করছে, তা হলে আশ্রম বরণ করে সৎভাবে জীবন যাপন কর এবং আমাদের আন্দোলনে দান কর। গৃহস্থ হিসাবে তুমি স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে যোগদান করে ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউটের সেবায় সাহায্য করতে পার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, কে সন্ন্যাসী, কে গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র– তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার বুদ্ধি আছে। খুব বেশি করে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন কর। যদি তুমি মনে কর, তোমার বিবাহ করা উচিত, তা হলে তা কর এবং সেবা দানের মাধ্যমে ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউটকে সাহায্য কর। একটি সাধারণ বোকা লোকের মতো হয়ো না, এই আমার অনুরোধ জীবনের যে কোনও অবস্থায় কৃষ্ণভাবনামৃতকে সংরক্ষণ কর। সেটিই সাফল্য।" (শিক্ষামৃত, পৃঃ ৮৭২)

উপাখ্যানে উপদেশ

ঝগড়াটে

দুটি বিড়াল এক লোকের বাড়ীতে কিছু পিঠা চুরি করেছিল। তারপর পিঠা নিয়ে তারা সমানভাবে ভাগ করতে না পেরে ঝগড়া করতে শুরু করল। এক বিড়াল বলল, তুই বেশি নিয়েছিস। অন্য বিড়াল বলল, না না আমারই কম।

তাদের ঝগড়া শুনে একটি ক্ষুধার্ত বানর সেখানে এল। বানর বলল, কি ব্যাপার! এই সাত সকালে এত ঝগড়া কিসের? বিড়ালেরা বলল, আমরা পিঠাগুলি সমান ভাগ করতে পারছি না। বানর বলল, আমি তোমাদের সমস্যার সহজ সমাধান করে দিতে পারব। বিড়ালেরা বলল, হ্যাঁ, তাই করে দাও। দুই বিড়ালের পিঠাগুলি বানর নিয়ে নিল। তারপর সে লম্বা লাফ দিয়ে গাছে উঠে গেল।

বিড়ালেরা বলল, দয়া করে আমাদের পিঠা দিয়ে দাও। বানর বলল, তোরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে পটু। তোরা পিঠা খাওয়ার যোগ্য নস্।

তোরা দয়া করে এখান থেকে চুপচাপ পালিয়ে যা। নইলে ঐ ঘরের লোক তোদেরকে পিঠাচোর জেনে লাঠিপেটা করবে। এই বলে বানরটি আনন্দে সব পিঠা খেয়ে নিল।

বিড়ালেরা হতাশ হয়ে চলে গেল। তারা বলতে লাগল, হায় হায়, বিবাদ না করে নিজেদের মধ্যে প্রীতি সহকারে পিঠা খেয়ে নিলে ভাল হত।

হিতোপদেশ

সহ্য শক্তি, ধৈর্য শক্তি না থাকলে সব সময় ঠকতে হয়। নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রীতি না থাকলে কালচক্রে হতাশ হতে হয়।

পিঁপড়েদের যুদ্ধ

একটি মাঠে অসংখ্য বিষ পিঁপড়ে বাস করত। পিঁপড়েদের দুটি বড় পরিবার ছিল। প্রতিদিন তারা মাঠে শুঁয়োঘাসের বীজ সংগ্রহ করত। কখন কেঁচো ইত্যাদি পোকামাকড় তারা দেখত। আর সেগুলি খাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত।

একদিন একটি কেঁচোকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারে বিষম বিবাদ শুরু হল। দুই বিরোধী দলের পিঁপড়েগুলো একে অন্যকে কামড়াতে লাগল। সেই যুদ্ধে বহু পিঁপড়ে মারা গেল। বাকী যারা বেঁচেছিল তারাও যুদ্ধ চালাতে লাগল। সে যুদ্ধ বন্ধের মতো কোন পরিস্থিতিই দেখা গেল না।

তারপর একদিন সেই মাঠের মালিক এল। সে মাঠটিকে পুকুর করবার উদ্দেশ্যে বহু লোক নিয়ে এল। ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি মাথায় করে লোকেরা দূরে ফেলতে লাগল। সেই ঘটনার ফলে পিঁপড়েদের আত্মীয়বর্গ সব মারা পড়ল। ঘরবাড়ি, খাবার দাবার সব নষ্ট হয়ে গেল। সামান্য যে কটি পিঁপড়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়ে বেঁচে ছিল তারা তখন পক্ষবিপক্ষ দলাদলি ভুলে গেল। নতুন করে তারা আবার জীবন গঠনের চিন্তা শুরু করল।

হিতোপদেশ

সমাজে মানুষও দলাদলি করে বিষম যুদ্ধ লাগিয়ে রাখছে। প্রকৃতির নিয়মে একদিন কোথায় সবাই হারিয়ে যাবে। আবার নতুন জন্ম নতুন জীবনে তাদের ফিরতে হবে।

ভাঙ্গা হাটে ভেকুরাম

আসল নাম বিক্রম দত্ত। লোকে উপহাস ছলে ভেকুরাম বলেই ডাকে। কারণ সে সময় থাকতে, সুযোগ থাকতে যে কাজ করার কথা তা করে না। একদিন সে বাড়ি থেকে কিছু টাকা নিয়ে হাটে গেল। পথের মাঝে পুলের ধারে বসে গল্প করতে লাগল।

হাট ভাঙ্গার সময় সে হাটে এসে পৌঁছল। তখন বেচাকেনার লোক তেমন নেই। সবজীর বাজারে গিয়ে দেখল ব্যাপারীরা চলে যাওয়ার জন্য জিনিষপত্র গুটিয়ে ফেলছে। ভেকুরাম বলল, "ও ভাই, দোকান গোছাও কেন? আমি সবজী নেব।"

সেই সময় 'পুঁইশাক চাই' পুঁইশাক চাই' বলে একজন হাঁক দিচ্ছিল। ভেকুরাম ভাবল কি আর করা যাবে, পুঁইশাক কেনা যাক। তখন পঁচা শাক সে সস্তায় কিনল। মোটামোটি আলু, বেগুন, পটল, সবই যা পেল বাড়ি নিয়ে চলল। বাড়ির লোকেরা বলল, "এসব পঁচা জিনিষ এনেছ কেন? হাটে কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায় না?

ভেকুরাম বলল, "আমার শরীরটা খারাপ লাগল, তাই পুলের উপর বসে পড়েছিলাম। এদিকে হাট ভেঙ্গে যায় যায়। ভাঙ্গা হাটে যা পেলাম তাই আনতে হল।" প্রতিবেশী লোকেরা বলতে লাগল, "এই জন্যেই তো নামটি ভেকুরাম। ভাঙ্গা হাটে কে আর থাকে, একমাত্র ভেকুরাম ছাড়া?" ভেকুরামের ভাই সব আলু, বেগুন, শাক ঘরের বাইরে ফেলে দিল। কয়েকটি ছাগল এসে সেই সব খেয়ে নিল । ভেকুরাম অত্যন্ত লজ্জা পেল।

হিতোপদেশ

ভাঙ্গা হাটে ভালো জিনিষ পাওয়ার সুযোগ থাকে না। আগে ভাগে হাটে যেতে হয়। জীবনের আয়ুষ্কাল যখন শেষ হয়ে যায় তখন হরিভজন হয় না। সুস্থ জীবনই হরিভজনের সুন্দর সময়।

জীবনের প্রথম দিকে ফাঁকি দিয়ে অন্তিম সময়ে হরিভজন ভালো হয় না। জরাজীর্ণ জীবন বেকার জীবন।

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

প্রশ্নঃ । কাউকে সম্বোধন করতে গিয়ে 'জয় গুরু' 'জয় নিতাই' 'জয় রাধে' না বলে 'হরেকৃষ্ণ' কেন বলা হয়?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রীমতি গৌরী রানী বৈদ্য, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

উত্তরঃ সম্বোধনে এই চারটি কথার যে কোনটিই বলা যায়। স্থান, কাল ও পাত্র মহিমাকে কেন্দ্র করে কাউকে সম্বোধন করতে গিয়ে এরূপ উচ্চারণ করা হয়। আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের লোকেরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক। আমাদের মহামন্ত্রই 'হরেকৃষ্ণ'। নিত্য এই 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন করতে হয়। শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই আমাদের হরেকৃষ্ণ কীর্তন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই বল 'হরেকৃষ্ণ'

প্রশ্নঃ । কলিযুগের পাপীতাপী পতিত মানুষদের উদ্ধারের জন্য একমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কেন, অন্য কোনও সংস্থা তো হতে পারে?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী নারায়ণ রাজবংশী, ছোট বক্সনগর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা- ১৩২০।

উত্তর ঃ বেদ-নির্ধারিত কলিযুগের ধর্ম 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ ও কীর্তনে প্রবৃত্তি হওয়ার শিক্ষা এবং শ্রীমদ্ভাগবত নির্ধারিত কলির চারটি পাপকর্ম (১) আমিষ আহার, (২) নেশাভাঙ, (৩) জুয়া তাস ও (৪) অবৈধ যৌনতা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাদর্শ এই পৃথিবীতে কোন সংস্থা প্রচার করছে? একমাত্র ইস্কন সারা পৃথিবী জুড়ে কলিবদ্ধ জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উত্তীর্ণ হবার বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করছে এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন। এই পারমার্থিক সংস্থা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

এই সংস্থা বাদ দিয়ে আপনি অন্য দিক দেখুন, তারা মন্ত্র দিচ্ছে, কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে না। তারা কত নিয়ম দিচ্ছে কিন্তু সর্বপাপের মূল এই চারটি পাপ সম্পর্কে কাউকে সতর্ক করায় না। তারা লোকদল বাড়াবার জন্য সাধারণ-সরল লোকদেরকে প্রভাবিত করে 'আমার কাছে মন্ত্র নাও। নিয়ম রয়েছে, কিন্তু তোমার মন যেভাবে চায় সেইভাবে চলো। নিয়ম মানলে ভালো। কিন্তু মন যতদিন নিয়ম মানতে রাজি হচ্ছে না, ততদিন না মানলেও সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া তোমরা সংসারী গৃহী মানুষ-সব নিয়ম পালন করতে পারবে না। কেবল আমার স্মরণ নিলেই চলবে। পাপ আপনা-আপনি সরে যাবে। যে কোনও একটা মতে চললেই হল।' এরকম ঠুনকো অসার কথা কৃষ্ণভাবনামৃতে নেই।

প্রশ্নঃ 'হরিভজনের সময় নেই।' কথাটি কি ঠিক?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী বিজয় সাহা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ভক্তিশূন্য কাজকর্মে কিংবা অসার চিন্তাভাবনায় অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষদের সত্যিই ভগবদ্ ভজনের সময় নেই। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, অপকর্ম ইত্যাদিতে তারা আকৃষ্ট। হরিভক্তি তারা পছন্দ করে না। জন্ম-মৃত্যুর ঘূর্ণিপাকে বদ্ধ পাগলের মতো সংসার ভোগ করবার জন্য তাদের কালরূপী শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অনেক সময় দেবেন সন্দেহ নেই।

প্রশ্নঃ কৃষ্ণ যখন আমাকে কৃপা করবেন তখন আমি কৃষ্ণনাম করতে পারব। কৃষ্ণ না কৃপা করলে কি করে কৃষ্ণনাম করব?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী মন্টু চন্দ্র দে, নাটোর।

উত্তরঃ যুক্তিটি বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও অনেকটা এই রকম যে, আমি বিছানায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে থাকব। কৃষ্ণ যদি কৃপা করে ওষুধ পত্রাদি না খাইয়ে দিয়ে যান, তবে আমি কিছুই খাব না, পড়ে থাকব আর ছটপট করতে থাকব। ওষুধপাতি ছোঁব না। এইভাবে সব দোষ সব দায়িত্বে কৃষ্ণের উপর দিয়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। কথায় বলে অতি পণ্ডিতের গলায় দড়ি। অর্থাৎ গলায় আমি নিজে গিয়ে ঝুলব আর কৃষ্ণ যদি রক্ষা করেন তবে আমি বাঁচতে পারব। অন্যথায় আমার বাঁচার দরকার নাই। এই সব যুক্তির জাল যারা বিস্তার করছেন তারা নিদারুণভাবে মূর্খামি করছেনই।

আরও অনেকে যুক্তি দিচ্ছেন যে, সারা জীবন

আমি কত কষ্ট পাচ্ছি, আমাকে কতই না কর্ম করতে হয়। অতএব আমি হরিনাম করতে সময় পাব কোথায়। এক সময় বিদেশে একজন ভদ্রমহিলা তাঁর পতিকে বলছেন, 'তুমি দয়া করে হরিনাম জপ করো। প্লীজ, ইউ চ্যান্ট্।" পতি বলছেন, 'আমি পারি না। আই ক্যান্ট্।' পত্নী বলছেন 'জপ করো, জপ করো। ক্যান্ট ক্যান্ট। পতি বলছেন পারি না পারি না। ক্যান্ট ক্যান্ট। অথচ যতক্ষণ তিনি পারি না বা ক্যান্ট ক্যান্ট করছেন ততক্ষণই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বললেই কৃষ্ণনাম জপ বা চ্যান্ট্ করা হয়েই যায়।

আমি সারাদিন কত কথা বলছি। কত সময় চলে যাচ্ছে। কেবল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' এই মহামন্ত্র জপ করলে জীবনের কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। বরং লাভই হয়।

শাস্ত্রের নির্দেশ হল এই হরিনাম জপ কীর্তন একান্ত ভাবে করলে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ভবচক্র অতিক্রম করে আনন্দময় জগতে উন্নীত হতে পারবে। কৃষ্ণ কৃপা করলে নাম করব এই রকম বুদ্ধি ছেড়ে কৃষ্ণনাম করে কৃষ্ণকৃপা পেতে পারব এই রকম ভাবনা থাকা উচিত। মহামন্ত্রটি একটি প্রার্থনা। আগে প্রার্থনা করে তবে কৃপা পাওয়া যায়। কারও কৃপা লাভ করতে হলে তাঁর কাছে আগে প্রার্থনা করতে হয়। আগে কেউ কৃপা করলে তারপরে প্রার্থনা করতে হয় না। আগে কেউ কৃপা করলে তারপরে প্রার্থনা করব এমটি তো পাগলের মতো কথা।

প্রশ্নঃ অনেক সময় দেখা যায় দুর্ঘটনা বা বিপদ থেকে ভক্তকে ভগবান রক্ষা করেন না, কেন?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী কৃষ্ণকান্তি সরকার, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তরঃ দুর্ঘটনাকেও শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের বিশেষ কৃপারূপে গ্রহণ করে থাকেন। যেমন, শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ এক ব্রাহ্মণদ্বারা অভিশপ্ত ছিলেন যে, সাতদিনের মধ্যে তক্ষক দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে। তখন তিনি জাগতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে অবসর নিয়ে সাতদিন গভীর মনোযোগে মুক্তপুরুষ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ থেকে ভাগবত শ্রবণ করতে করতে অনায়াসে ভগবদধামে গমন করলেন। তক্ষক দংশন করল ঠিকই, কিন্তু দংশন যাতনা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। কারণ তিনি ভগবৎচেতনায় আবিষ্ট ছিলেন। কেবলমাত্র সেই ঘটনাকে মাধ্যম করে তিনি জড়জগৎ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করলেন। যা অভক্তদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভগবান এমন করতেন যাতে তক্ষক কিছুতেই পরীক্ষিৎ মহারাজকে দংশন করতে না পেরে একেবারে পালিয়ে যেত, তা হলে আপনি হয়তো মনে করতেন যে, ভগবান ভক্তদের রক্ষা করলেন। তক্ষক দংশন করল মানেই-ভগবান ভক্তকে রক্ষা করলেন না। তাই না? কিন্তু এভাবে বাহ্য দৃষ্টিতে ভগবানের ভক্তরক্ষা কার্য বিচার করা হয় না।

অনেকের ধারণা এই যে, ভক্ত হলে তিনি আর কোনও প্রকার দুর্ঘটনা বা বিপত্তির সম্মুখীন হবেন না। কিন্তু তা ঠিক নয়। জড় জগৎ বলতে দুর্ঘটনা বা বিপত্তিপূর্ণ জগৎ। এখানে বিপত্তি থাকবেই। কিন্তু কৃষ্ণচেতনাময় ভক্ত সেই সব বিপত্তির মুখে আরও বেশি করে কৃষ্ণশরণাগত থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ-দুঃখে থাকো, সুখে থাকো, সদা 'হরি' বলে ডাকো। যদি এই জগতে প্রাণ থাকে তবে কৃষ্ণভজনা করতে হবে, প্রাণহানি হলে কৃষ্ণলোকে ফিরে যাবেন। এটিই ভক্তজীবনের মুনাফা।

প্রশ্নঃ আমরা দেখি যে, মানুষ বোঝে-তাদের সংসারটি দুঃখময়। তাদের জীবন ক্লেশময়, এবং এও বোঝে যে, কৃষ্ণভজন করারই দরকার রয়েছে। তারা ব্যক্তিগতভাবে বোঝে, কৃষ্ণভজন বিনা দুস্তর দুঃখময় জীবন থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না, তবুও তারা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে না। কেন?

প্রশ্নকর্তাঃ ডাঃ মিলন কান্তি বিশ্বাস, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ আমরা বিভিন্ন ধরনের ভবরোগী। রোগে কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু ওষুধ খেতে চাইছি না, ডাক্তারী পরামর্শ নিচ্ছি না। এগুলি মানসিক রোগ। যে বলছে, কৃষ্ণভজন করা দরকার, সে-ই যদি বলে, এখন সময় নেই পরে করব, তা হলে বুঝতে হবে বহু জন্মের অনেক অনর্থ জমা হয়ে আছে মনের মধ্যে। আর অচিরেই ভজন শুরু করে দিলেই ধীরে ধীরে অনর্থ দূর হবে এটি সুনিশ্চিত বলেই শাস্ত্র নির্দিষ্ট। এই দুঃখময় সংসারের দিকে আমি খুবই কাজের লোক, পরিশ্রমী, উদ্যমী, কিন্তু ভজন রাজ্যের দিকে অকাজী, অলস, উদ্যমহীন। তা হলে পরিণামটি অবশ্যই হতাশায় পর্যবসিত হয়। যথেষ্ট

সাধুসঙ্গ, হরিনাম কীর্তন, জপ, হরিকথা শ্রবণ, কৃষ্ণসেবায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য অবশ্যই সুযোগ নিতে হবে। মানুষ্য-জন্মেই সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু আয়ুষ্কাল অতি অল্প। বর্তমানে যদি ভজন সাধন এড়িয়ে থাকি নানা অজুহাতে, ভবিষ্যতেও অজুহাতগুলো নতুন অজুহাত এনে জড়ো করবে আর ভজন সাধন করতে সুযোগ দেবে না। বরং ভজন করতে থাকলে ভজনফলে অজুহাত একে একে পালিয়ে যায়।

প্রশ্নঃ কৃষ্ণভক্তকে যোগমায়া দুর্গার পূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে, অথচ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও যোগমায়া ভ্রাতা ও ভগিনীরূপে আবির্ভূত হলেন। ভ্রাতার পূজা করা হবে, কিন্তু ভগিনীর পূজা হবে না কেন?

প্রশ্নকর্তাঃ অনিমেষ সরকার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যোগমায়ার পূজা করতে কাউকে কোথাও নিষেধ করা হয়নি। ভক্তরাই যোগমায়ার পূজা করে। অভক্তরা কখনই যোগমায়ার পূজা করে না। অভক্তরা সব সময় মহামায়ার পূজায় আগ্রহী।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা এই উভয় শক্তিরই দুর্গা, মহামায়া প্রভৃতি নাম নানা শাস্ত্রে দেখা যায়। অন্তরঙ্গা শক্তির উপাসনায় কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তির উপাসনায় জড়জাগতিক বৈভব প্রাপ্তি হয়ে থাকে। যিনি যা কামনা করবেন তাঁর সেই শক্তির উপাসনা করা হয়। 'ধন দাও, যশ দাও, পুত্র দাও, সরকারী চাকুরী দাও, সুন্দরী স্ত্রী দাও, ডিগ্রী পাস, জমিজমা ভোগ, রাজত্ব, মন্ত্রীত্ব'—এই রকম কিছু বাসনা নিয়ে দুর্গাপূজা করলে তিনি বহিরঙ্গা মহামায়া রূপে মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় উন্মুখী হলে যে শক্তি সহায়তা করেন সেই শক্তিই যোগমায়া, আর কৃষ্ণবহির্মুখ হলে যে শক্তি জড়জাগতিক ভোগ্যবস্তু দিয়ে কৃষ্ণ থেকে ভুলিয়ে রাখতে সহায়তা করেন সেই শক্তিই মহামায়া।

কাত্যায়নী দুর্গারই অন্য নাম। শ্রীবৃন্দাবনের গোপবালিকাগণ যে কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করেছিলেন সেই ক্ষেত্রে তাঁদের আরাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করা। অত্যন্ত সম্মানীয়া মহা প্রজ্ঞাবতী শ্রীবৃন্দাদেবীর নির্দেশে গোপবালিকারা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করবার আশায় কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তিনি সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। গোপকুমারীগণ কোনও বদ্ধ জীবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নী ব্রত করেননি। সেই কাত্যায়নী যোগমায়া।

কিন্তু অভক্তরা অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্মুখ ব্যক্তিরা জড়জাগতিক সম্পদ উপভোগের উদ্দেশ্যে দুর্গাপূজা করে, সেই দুর্গা হচ্ছেন মহামায়া। মহামায়ার দেওয়া সম্পদ পরিণামে দুঃখই দান করে। জড়জাগতিক ভোগবাসনার জন্য এই জড় জগৎ থেকে জীবন কখনই স্বস্তি লাভ করতে পারে না। মৃত্যুময় ভবচক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তাকে জন্মমৃত্যুর চক্রে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই দুঃখময় জড় জগতে বদ্ধ হয়েই থাকতে হয়।

কেউ যদি কৃষ্ণভক্তি আকাঙ্খী হন তবে কৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত হয়ে এই মহামায়ার দুঃখ ও উদ্বেগপূর্ণ জড় জগৎ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারবেন। এই কথা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেনঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তাকে কেউই সহজে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করে তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।" (গীতা ৭/১৪)

কিন্তু জগতের অসুর প্রকৃতির মানুষেরা দুর্গা বা কালীকে পরম আরাধ্যা রূপে গ্রহণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ রূপে কল্পনা করে। আবার অনেকে মনে করে কালীপূজা, দুর্গাপূজা আর কৃষ্ণপূজা একই কথা। এই ধরনের লোকেরা মায়াপহৃত জ্ঞানাঃ। মহামায়া তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অপহরণ করেছেন। কারণ তারা কৃষ্ণের চরণে অপরাধী। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণপূজা করে, তবে তাঁর প্রতি সমস্ত দেব-দেবী প্রসন্ন হন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। (ভাগবত ৪/৩১/১৪ দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণভক্তি আছে যার সর্বদেব বন্ধু তার॥

জড় জগতে মহামায়া দুর্গাদেবী হচ্ছেন চিৎজগতের যোগমায়ার ছায়া স্বরূপিনী। শ্রীব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"ভগবানের স্বরূপ শক্তি বা চিৎ শক্তির ছায়া স্বরূপা, জড় জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধনকারিণী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৪৪)

প্রশ্নঃ যে কোনও লোক কি বৈষ্ণব হতে পারে?
প্রশ্নকর্তাঃ প্রিয়তোষ দাস, নাজিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ বস্তুতপক্ষে প্রত্যেকের স্বরূপই বৈষ্ণবতা। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে (ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু) প্রত্যেকের হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান। আর প্রত্যেক জীবের পরিচয় হল সে শ্রীবিষ্ণুর নিত্য দাস অর্থাৎ বৈষ্ণব। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। ভগবানের সেবা করাই তার একমাত্র ধর্ম। সেটা না জানাই অজ্ঞতার কারণ। তাই যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই হতে পারেন।

প্রশ্নঃ অনেকে বলছেন, যে কোন মতপথ ধরেই ভগবানকে পাওয়া যায়। আর আপনারা বলছেন একমাত্র হরিনাম। কোনটা ঠিক?

প্রশ্নকর্তাঃ মনোরঞ্জন শীল, গোপালগঞ্জ।
উত্তরঃ কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি একথা বলেন না, যে কোনও মতপথ ধরে চললেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। নরকের পথ ধরে স্বর্গে যাওয়া যায় না। কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে যেতে হলে, আগে জানতে হয় সেই পথটা কোন্‌টি, কতদূরে, কিভাবে যেতে হবে ইত্যাদি। যে কোনও পথে, যে কোন বাসে বা ট্রেনে বা নৌকায় চড়ে একই লক্ষ্যে পৌছে যাব– এটি উন্মত্ত ব্যক্তির কথা। পথহারা হলে লোকে গাইড-বুক দেখে, ট্রাফিক পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে, ভদ্রলোকদের কাছে জেনে নিয়ে থাকে। কলিযুগের মানষুকে যদি ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হয় তবে শাস্ত্রীয় নির্দেশ রয়েছে–
'কীর্তনাদ এব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেৎ'। কৃষ্ণনাম কীর্তন করে পরম ধামে উন্নীত হওয়া যাবে। হরিনাম ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই নেই নেই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব্য নাস্ত্যেব্য নাস্ত্যেব্য গতিরণ্যথা॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

প্রশ্নঃ মেয়েদের মাসিক ঋতুকালে জপমালাতে মহামন্ত্র জপ করা চলে কিনা?
প্রশ্নকর্তাঃ শ্রীমতি দিপালী চক্রবর্তী, ঢাকা
উত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন 'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ' অর্থাৎ, হরিনাম স্মরণের কোনও কালাদি নিয়ম বিধি বিচার নেই। দীক্ষা কালে রোজই জপমালায় সংখ্যা রেখে জপ করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে। অতএব মাসিক অশুদ্ধ কালেও জপমালাতে হরিনাম জপে কোন দোষ নেই।

উত্তরদাতাঃ সনাতন গোপাল দাস

প্রশ্নঃ বর্তমানে অবধূত সংঘাশ্রীত ভক্তেরা গুরুব্রহ্মা, গুরুশ্যাম, গুরুশিব, গুরুরাম। এই নামে উচ্চস্বরে কীর্তন করে থাকেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই নাম কি গোলকে গোপনে ছিল কি?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী সুধীর রঞ্জন দেবনাথ, বেতাগী, বরগুণা
উত্তরঃ না। শ্রী নরোত্তম ঠাকুর বলেছেন–
গোলকেরও প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন
রতি না জন্মিল কেনে তাই।

নাম রূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার।
এতাদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচী কুমার॥
কলিযুগের পাবন অবতারী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বললেন,
চারি যুগে চারি ধর্ম জীবের কারন।
কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন॥

অতএব, কলিযুগে নাম যজ্ঞসার।
অন্যকোন ধর্ম কৈলে জীব নাহি হয় পার॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপগিয়া করিয়া নিরবন্ধ॥ (চৈ.ভাগবত)

ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
ইহা বল সর্বক্ষণ বিধি নাহি আর॥ (চৈ.ভাগবত)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব্য নাস্ত্যেব্য নাস্ত্যেব্য গতিরণ্যথা॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

কলিযুগে হরিনাম ছাড়া জীব উদ্ধারের কোন গতি নাই গতি নাই গতি নাই, অতএব কৃষ্ণ নাম ভজ জীব, আর সব মিছে, পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে
উত্তরদাতাঃ শ্রী চিদানন্দ কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, ঢাকা।

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তেরা প্রকৃত সাধু। সাধু বা ভক্তের প্রথম গুণ হচ্ছে অহিংসা। যারা ভগবদ্ভক্তির মার্গে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক, অথবা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী, তাদের প্রথমেই অহিংসার আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। সাধুর বর্ণনা করে বলা হয়েছে তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৫/২১)। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং অন্যের প্রতি কৃপালু হওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তিনি নিজে আহত হলে তা সহ্য করেন, কিন্তু অন্য কেউ যদি আঘাত পায়, ভগবদ্ভক্ত তা সহ্য করেন না। সারা পৃথিবী হিংসায় পূর্ণ, এবং ভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সেই হিংসা বন্ধ করা। বিশেষ করে অনর্থক যে পশুহত্যা হচ্ছে তা বন্ধ করা। ভগবদ্ভক্ত কেবল মানব সমাজেরই সুহৃদ নন, তিনি সমস্ত জীবের পরম বন্ধু কারণ তিনি সমস্ত জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তানরূপে দর্শন করেন। তিনি কেবল নিজেকে ভগবানের সন্তান বলে দাবি করে অন্যদের আত্মা নেই বলে তাদের হত্যা করতে অনুমোদন করেন না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও এই প্রকার বিচার পোষণ করেন না। তিনি সুহৃদঃ সর্ব-দেহিনাম্- ভগবানের প্রকৃত ভক্ত সমস্ত জীবদের বন্ধু । ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবদের পিতা, তাই কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। তাকে বলা হয় অহিংসা। এই প্রকার অহিংসা আচরণ তখনই সম্ভব, যখন আমরা মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। তাই, বৈষ্ণব-দর্শন অনুসারে আমাদের চারটি সম্প্রদায়ের মহান আচার্যদের বা গুরু পরম্পরার অনুসরণ করতে হয়।

গুরু পরম্পরা ব্যতীত পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা হাস্যকর। তাই বলা হয়েছে আচার্যবান্ পুরুষো বেদ-যিনি আচার্য পরম্পরাকে অনুসরন করেন তিনি বস্তুকে প্রকৃতরূপে জানতে পরেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/১৪২)। তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ- দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য (মুণ্ডক উপনিষদ ১/২/১২)।

পারমার্থিক জীবনে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হয়, যাতে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ না করে থাকা না যায়। এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যাতে খাওয়ার সময়, শোয়ার সময় চলার সময় কাজ করার সময় সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকা যায়।

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে উপদেশ দেওয়া হয় যে, আমাদের জীবন যেন আমরা এমনভাবে গড়ে তুলি, যাতে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করা যায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে ভক্তরা যখন 'স্পিরিচুয়াল স্কাই' নামক আগরবাতি তৈরি করে, তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণভক্তের মহিমা শ্রবণ করে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ- সর্বদাই শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত। বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ- কখনও বিষ্ণুকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমরা যদি নিরন্তর ভগবানের কথা শ্রবণ করি তা হলে এই প্রকার স্মরণ সম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদগীতা অথবা এই প্রকার প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করা মানে হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় বাস করা। যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বিধিনিষেধ পালন করেন, তাঁদের পক্ষেই এইভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া সম্ভব। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ভক্তদের প্রতিদিন জপমালায় ষোল মালা জপ করা এবং বিধি-নিষেধগুলি পালন করার নির্দেশ দিই। ভক্তদের পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধনে তা সাহায্য করে।

ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা সম্ভব। ইন্দ্রিয়-সংযমের ফলে, মানুষ স্বামী অথবা গোস্বামী হতে পারেন। তাই যাঁরা স্বামী অথবা গোস্বামী, এই চূড়ান্ত উপাধি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ইন্দ্রিয়-সংযম করা অবশ্য কর্তব্য। নিঃসন্দেহে তাঁকে ইন্দ্রিয়ের স্বামী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রিয়গুলি যদি কখনও স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে চায়, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সেগুলিকে সংযত করা। আমরা যদি কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রবণতা বর্জন করি, তা হলে আপনা থেকেই ইন্দ্রিয় সংযম হবে।

আমাদের কখনও অন্যদের ধর্মের সমালোচনা করা উচিত নয়। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ধর্ম রয়েছে। তামসিক ও রাজসিক ধর্ম কখনও সাত্ত্বিক ধর্মের মতো পূর্ণ নয়। ভগবদগীতায় সব কিছুই তিনটি গুণ অনুসারে বিভক্ত হয়েছে। মানুষ যখন প্রধানত রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তখন তাদের ধর্মের পন্থাও সেই গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই সমস্ত পন্থার সমালোচনা করার পরিবর্তে, ভগবদ্ভক্ত সেই সমস্ত ধর্মের অনুগামীদের তাদের স্বীয় ধর্ম অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করেন, যাতে তারা ধীরে ধীরে সাত্ত্বিক ধর্মের স্তরে উন্নীত হতে পারে। তা না করে ভক্ত যদি কেবল তাদের সমালোচনাই করেন, তা হলে ভক্তের মন ক্ষুব্ধ হবে। অতএব ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং চিত্তের বিক্ষোভ রোধ করতে চেষ্টা করা।

ভক্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরল জীবন যাপন করা। বিষয়ীদের মতো অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করা ভক্তের উচিত নয়। ভক্তকে উন্নত ভাবধারা সমন্বিত সরল জীবন যাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্ভক্তির আচরণের উদ্দেশ্যে দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই তাঁর গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা অথবা নিদ্রা যাওয়া তাঁর উচিত নয়। কেবলমাত্র দেহ ধারণের জন্য আহার করা উচিত, কিন্তু আহার করার জন্য তাঁর দেহ ধারণ করা উচিত নয়, এবং কেবলমাত্র ছয় থেকে সাত ঘন্টা ঘুমানো উচিত। ভক্তদের এই আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য। যতক্ষণ দেহ রয়েছে, ততক্ষণ তা ঋতু পরিবর্তন, ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ও ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হবেই। সেগুলি এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

নবীন ভক্তরা কখনও কখনও চিঠিতে প্রশ্ন করে, কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা সত্ত্বেও, কেন তাদের রোগ হচ্ছে। তাদের জানা উচিত যে, তাদের এই দ্বন্দ্বভাব সহ্য করতে হবে। এই জগৎ দ্বৈতভাব সমন্বিত। কখনও কারও মনে করা উচিত নয় যে, অসুখ হলে ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে তাঁর অধঃপতন হয়েছে। জড়জাগতিক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন চলতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবদগীতায় (২/১৪) উপদেশ দিয়েছেন, তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত- "হে অর্জুন! ভক্তিতে স্থির হয়ে, এই সমস্ত বিড়ম্বনা সহ্য করতে চেষ্টা কর।"

সম্পাদকীয়

তিনি সমস্ত জীবের বন্ধু

জড় জগতে সকলেই ধনসম্পদ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যথা সম্ভব ধন উপার্জন করা এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে তা ব্যয় করা। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ বর্ণনা করে বলেছেন–

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ২/১/৩)

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের এটিই হচ্ছে আদর্শ উদাহরণ। রাত্রিবেলা ছয় ঘন্টায় বেশি ঘুমিয়ে অথবা মৈথুন ক্রিয়ায় তারা তাদের সময়ের অপচয় করে। এটি হচ্ছে তাদের রাতের কর্ম, আর দিনের বেলায় তারা অফিসে অথবা ব্যবসার স্থানে গিয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। কিছু টাকা পাওয়া মাত্রই তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য নানান জিনিস খরিদ করে। এই প্রকার ব্যক্তিরা কখনও জীবনের মাহাত্ম্য বুঝতে চেষ্টা করে না। ভগবান কে, জীবাত্মা কি, ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কি, ইত্যাদি সম্বন্ধে তারা কখনও ভেবে দেখে না।

বর্তমানে অবস্থার এতই অবনতি হয়েছে যে, যাদের ধার্মিক বলে মনে করা হয়, তারাও কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত। এই কলিযুগে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা অন্যান্য যুগের থেকে অনেক বেশি; তাই যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষদের সেবা করা, এবং সেই সঙ্গে ধন উপার্জন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা। তাই বলা হয়েছে– ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২/৪২) ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতিসাধন করতে হলে, জড়জাগতিক জীবনের প্রতি বিরক্ত হতে হবে। যে বিষয় ভক্তের তৃপ্তিসাধন করে, তা অভক্তদের কাছে সম্পূর্ণ অরুচিকর।

কেবল নিষ্ক্রিয় হলে অথবা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করলেই হবে না, যথাযথ বৃত্তিতে যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কখনও কখনও দেখা যায় যে, পারমার্থিক উন্নতিসাধনে আগ্রহী ব্যক্তিরা বৈষয়িক ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করে নির্জন স্থানে যান, যা যোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু তাও পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধনের সহায়ক হবে না, কারণ অনেক সময় দেখা গেছে যে, এই প্রকার যোগীদেরও অধঃপতন হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করার ফলে, জ্ঞানীরাও অধঃপতিত হয়। নির্বিশেষবাদী অথবা শূন্যবাদীরা জড়-জাগতিক সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু তারা ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়ার ফলে, চিন্ময় স্তরে স্থির থাকতে পারে না।

ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে। অর্থাৎ সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ কীর্তন করতে হবে। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি-সাধনের প্রধান পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই উপদেশ দিয়েছেন, যা আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে দেখতে পাই। কেউ যদি পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করতে চান, তা হলে তাঁর মহা সৌভাগ্যের ফলে তিনি সদ্গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন এবং তাঁর কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারেন। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই কৃপার ফলে, তিনি ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্ত হন, এবং তিনি যদি সেই বীজ তাঁর হৃদয়ে রোপন করেন এবং তাতে শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চন করেন, তা হলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেই ভক্তিলতা বর্ধিত হতে থাকে। সেই ভক্তিলতা এতই প্রবল যে, তা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে চিৎ-জগতে গিয়ে পৌঁছায় এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত, তা বর্ধিত হতে থাকে, ঠিক যেমন সাধারণ লতা ছাদের আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত বর্ধিত হতে থাকে। তার পর তাতে বাঞ্ছিত ফল ফলে। এই ফল উৎপন্ন হওয়ার প্রকৃত কারণ হচ্ছে শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল ভক্তিলতায় সিঞ্চন করা। এর তাৎপর্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে আগ্রহী মানুষ ভক্তসঙ্গ ব্যতীত থাকতে পারেন না, তাঁকে অবশ্যই ভক্তসঙ্গ বাস করতে হয়, যেখানে তিনি নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করতে পারেন।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছে, যাতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের শত শত কেন্দ্র মানুষকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করার এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকার সুযোগ দিতে পারে, এবং তার ফলে মানুষ তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে।

(বাকি অংশ ৩৯ পাতায় দেখুন)

তস্য হ বা এণকুণক উচ্চৈরেতস্মিন্ কৃতনিজাভিমানস্যাহরহস্তৎপোষণ–
পালনলালনপ্রীণনানুধ্যানেনাত্মনিয়মাঃ সহযমাঃ পুরুষপরিচর্যাদয়
একৈকশঃ কতিপয়েনাহর্গণেন বিযুজ্যমানাঃ কিল সর্ব এবোদবসন্ ॥৮॥ ভাগবত: স্কন্ধ ৫,অধ্যায় ৮
অনুবাদ: ধীরে ধীরে মহারাজ ভরত সেই মৃগটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তৃণ আদি দ্বারা পোষণ, বাঘ এবং অন্যান্য হিংস্র প্রাণিদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা, কণ্ডূয়ন আদির দ্বারা প্রীতি সম্পাদন, চুম্বন আদির দ্বারা লালন প্রভৃতির দ্বারা তিনি তাকে গভীর স্নেহে লালন-পালন করতে লাগলেন। এইভাবে হরিণ শিশুটির প্রতি আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কর্তব্য কর্মগুলি বিস্মৃত হয়েছিলেন, এবং ধীরে ধীরে তিনি ভগবানের আরাধনা থেকেও ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। এই ভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছিলের।